মোসলেম রাজনীতি

হুমায়ুন কবির

মূল্য—আট আনা

প্রথম সংস্করণ

ভাদ্র, ১৩৫০

পূর্ব্বাশা লিমিটেড হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
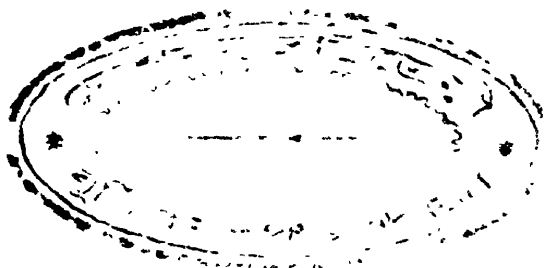
স্বাধীন বাঙলার অগ্রদূত

মরহুম আবদুর রসুল,

মবহুম মুজিবর রহমান

ও

মবহুম আবদুল করিমেব

স্মারক

সমস্ত পৃথিবীতেই বর্তমানে আসন্ন বিপ্লবের পূর্ব্বাভাস। মানুষের ভাগ্য নিয়ে যে খেলা চলেছে, তার পরিণতি কোথায় কে বলতে পারে? কেবলমাত্র একটা কথা নিঃসন্দেহ। পুরাতন পৃথিবীর পরিচিত চেহারা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়েছে। শুধু যে রাজ্য, দেশ ও জনপদের সীমানা বদলিয়েছে, তা নয়, সেই সঙ্গে অথবা হয়তো আরো গভীর ভাবে মানুষের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার রূপ ও প্রকৃতি পর্য্যন্ত চোখের সামনে রূপান্তরিত হচ্ছে। সমস্ত দুনিয়ার এ পরিবর্ত্তন যে ভারতবর্ষকেও পরিবর্ত্তিত করবে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। পৃথিবীর মানুষ পুরাতন আদর্শ ও আশ্রয়ের বন্দর ছেড়ে আজ অজ্ঞাত গন্তব্যের সন্ধানে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছে। সে পথচলায় ভারতবাসীও ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, যোগ দিতে বাধ্য, এবং তারা যোগ দিয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর মতন ভারতবর্ষও যুগসন্ধিক্ষণে আপনার পথ ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ে উদগ্রীব।

ভারতবর্ষের জীবনে মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। চারিদিকের আন্দোলন ও চাঞ্চল্যে তাদের মনেও সাড়া জেগেছে, কিন্তু অন্যের মত নানা দিকের নানা টানে তারাও বিভ্রান্ত। বিভিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক আদর্শ যুগপৎ তাদের টানছে। ধর্ম্ম ও ঐতিহ্যের বিচিত্র শক্তি তাদের মনেও সক্রিয়, এবং

এ সমস্ত আদর্শ ও আকর্ষণের শক্তি, গতি ও লক্ষ্যও বহুক্ষেত্রেই বিভিন্ন। বর্ত্তমানকে বুঝতে হলে তাই অতীত ইতিহাসের আলোচনা প্রয়োজন, কারণ বর্ত্তমানের সমস্যা ও সমাধান দুইয়েরই ভিত্তি সুদূর এবং অদূর অতীতের মধ্যে নিহিত। নিখিল ভারত মুসলীম লীগের সূত্রপাত, পরিণতি ও বিকলনের পশ্চাদপটে রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানের সাম্প্রতিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার সন্ধান বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১
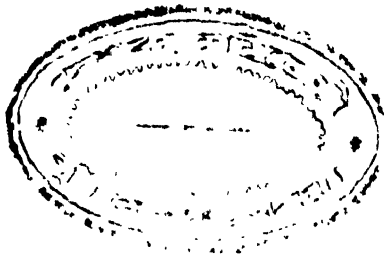
গত দশ বৎসরে মুসলীম লীগের ভাগ্যবিপর্যয় বিস্ময়কর। বিত্তশালী মুষ্টিমেয় মুসলমান অভিজাতের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে লীগের প্রতিষ্ঠা, এবং সূত্রপাতের সময় থেকেই রাজনৈতিক নিরাপত্তার দিকে তার দৃষ্টি। সে সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বিপ্লবী মতবাদের সূচনা দেখা দিয়েছে, এবং সেই বিপদসঙ্কুল ও চরম রাজনৈতিক কর্মপন্থা থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখাই লীগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থরক্ষার দাবী নিয়েই লীগের জন্ম, এবং কর্মসূচীর গোড়াতেই লীগের প্রতিষ্ঠাতারা ঘোষণা করেন যে ইংরেজের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা সে স্বার্থরক্ষার একমাত্র উপায়। কারণ দেওয়া হয় যে তখনো শিক্ষা, অর্থ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় এত পিছিয়ে রয়েছে যে ইংরেজের সহায়তা ভিন্ন তাদের নিজের স্বার্থরক্ষার শক্তি নাই। এখনকার দিনের অন্য বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতন লীগও কিন্তু কেবলমাত্র বিতর্কসভা হয়েই রইল। দশ বছর অর্থাৎ ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত আবেদন ও নিবেদনের বোঝা বয়েই তার কর্মধারার পরিসমাপ্তি। কংগ্রেসও ততদিনে বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী অধ্যায় শেষ করে আবার নিয়মতান্ত্রিক

নিরাপদ রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে—তাই ১৯১৬ সালে যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতা হবে এটা খুব আশ্চর্য্য নয়।

ভারতীয় রাজনীতির মোড় ঘুরবার সময় কিন্তু সেদিন আসন্ন হয়ে এসেছিল। তখন মহাযুদ্ধ চলছে এবং ১৯১৬-১৭ সালে তার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্তদের জোয়ারের সূচনা দেখা দিয়েছে। অন্নবস্ত্রাভাবে ভারতবর্ষের অদৃষ্টপূর্ব জনসমুদ্রেও যে চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সুরু, জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনায় তার পরিণতি সমস্ত দেশে বিক্ষোভ তীব্রতর করে তুলল। তুরস্কের ভাগ্যবিপর্য্যয় সে বিক্ষোভে ইন্ধন জোগালো—ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় খেলাফতের পুনর্প্রতিষ্ঠার দাবীতে সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দিল। ১৯২০-২২ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন আসমুদ্রহিমাচলের সর্ব্বত্র নতুন জীবনের প্লাবন এনেছিল, তাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ পর্য্যন্ত টলে উঠে। স্বাধীনতার সেই সংগ্রাম ঘোষণায় মুসলীম লীগও যোগ দিয়েছিল, কিন্তু সক্রিয় আন্দোলন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে পড়ল। লীগের সংগঠন ও কর্ম্মপদ্ধতিতে সক্রিয় আন্দোলনের স্থান ছিল না। তাই অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানের যে কর্ম্মতৎপরতা, মওলানা মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে খেলাফৎ কমিটীর মারফতেই তা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলীম লীগের নাম প্রায় মুছে এল এবং লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই সরকারের অনুগ্রহপ্রত্যাশীর দলে নাম লেখালেন। সে অনুগ্রহ তাদের জুটলও-১৯১৯ সালের ভারতীয় শাসন সংস্কারে যাঁরা সরকারকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলের ভাগ্যেই সরকারী প্রসাদ জুটেছে।

অসহযোগ আন্দোলন নানা কারণে সিদ্ধিলাভ করে নি। গান্ধীজীর এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভের ভরসা নিরাশায় পরিণত হল—

অবশেষে চৌরীচৌরার ব্যাপারে তিনি অকস্মাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। বাইরেও ঘটনাসংস্থান অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে গেল। কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক যেদিন খিলাফতের বিলোপ ঘোষণা করল, সেদিন ভারতীয় খিলাফৎ কমিটীর অস্তিত্বের ভিত্তিও ধ্বংস হয়ে গেল। আন্দোলনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার শেষে এল গভীর অবসাদ ও আত্মঅবিশ্বাস। রাষ্ট্রিক লক্ষ্যসাধনে ব্যর্থতার ফলে জনমানসে যে প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িক সন্দেহ, অপ্রীতি ও সংঘর্ষে তা আত্মপ্রকাশ করল। সক্রিয় আন্দোলনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি আবার প্রকট হয়ে উঠল। খিলাফৎ কমিটীর অকালমৃত্যুতে মসলীম লীগ আবার ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল। অসহযোগ সংগ্রামের অবসানে রণক্লান্ত কংগ্রেসের মধ্যেও নিয়মতান্ত্রিকতা দেখা দেওয়ায় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আবার নতুন করে বোঝাপড়ার চেষ্টা সুরু হল। সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার চেষ্টাও প্রবল হয়ে উঠল, কিন্তু নানা কারণে এ চেষ্টা সফল হতে পারেনি। একটা প্রধান কারণ এই যে ততদিনে কংগ্রেস ইংরাজের সম্বন্ধচ্যুত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবতে সুরু করেছে, কিন্তু সেদিনও লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন বৃটীশ আওতায় ডোমিনিয়ন রাজের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের কর্মধারাতে স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে গলদ ও মতভেদ ছিল। স্বাধীন ভারতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে মতান্তর তো ছিলই, তা ছাড়াও রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সংস্কৃতিগত অনেক পার্থক্য সম্বন্ধেও সেদিন কংগ্রেস পুরোপুরি ভাবে সজাগ হয়নি। স্বার্থের যে ঐক্যকে ভিত্তি করে কংগ্রেসের স্বরাজসাধনা, সে ঐক্য অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠির স্বার্থবৈচিত্র্যের সমন্বয় করতে

পারেনি, কিন্তু ঐক্যের মোহে সে পার্থক্যকে ভোলবার চেষ্টা করলেও পার্থক্য তাতে লুপ্ত হয়নি।

বোঝাপড়ার চেষ্টা চলছে, এরই মধ্যে এল পৃথিবীব্যাপী আর্থিক বিপর্যয়। ভারতীয় জনমানসে তার যে প্রতিক্রিয়া, তারই অভিব্যক্তি ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আবার কংগ্রেস সর্ব্বভারতীয় মানসকে জয় করে নিল—সংগ্রামবিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে আন্দোলনবিমুখ মুসলীম লীগের কথা ভুলিয়ে গেল। অসহযোগ ও খেলাফতের যুগে ভারতীয় মুসলমান যে উৎসাহে ও যে সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল, এবার তা ঘটল না বটে, কিন্তু এবার যারা যোগ দিল তারা এল নিছক রাজনীতির আহ্বানে। ১৯২০-২২ সালে অসহযোগের আন্দোলনে অনেকেই এসেছিল ধর্ম্ম প্রেরণার টানে। খেলাফতের যুগে মুসলীম নেতৃত্ব এনেছিলেন মওলানা মহম্মদ আলী, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ সক্রিয় আন্দোলনে বিশ্বাস কর্ম্মবীরের দল—এবার সীমান্ত প্রদেশের খোদাই খিদমতগার নেতা খাঁ আবদুল গফ্ফার খাঁর নেতৃত্বেই ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা মত্ত হয়ে উঠল। অহিংস ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভিত্তিতে পাঠান জিরগাদের মধ্যে খোদাই খিদমতগার আন্দোলনের স্রষ্টা হিসাবে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে খাঁ আবদুল গফ্ফার খাঁর স্থান অবিস্মরণীয়।

১৯৩০-৩২ সালে মুসলীম লীগের যে দুরবস্থা, বোধহয় পূর্ব্বে কোনদিন তা হয়নি। লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মুসলীম কনফারেন্সের সৃষ্টি হয়, এবং সরকারী অনুগ্রহ সে সময়ে কনফারেন্সের ভাগেই বেশী জুটত। ১৯২৮-২৯ সালে লীগ পর্য্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে কিছুদিন একই সঙ্গে দুটী লীগ চলল। কলকাতায় আলবার্ট হলে যখন লীগের একটী অংশের বাৎসরিক সভা, ঠিক সেইদিন সেই সময়েই হাওড়ায় লীগের

অন্য অংশের বাৎসরিক অধিবেশন। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের কথাবার্ত্তা যখন হয়, তখনও লীগের কোন প্রতিনিধিকে সেখানে ডাকা হয়নি। জিন্না সাহেব প্রথম অবস্থায় লীগবিরোধী ছিলেন, কিন্তু লীগে যোগদানের পরে ক্রমে ক্রমে তিনিই লীগের অন্যতম মধ্যপাত্র হয়ে দাঁড়ান। প্রথমবারের গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর আমন্ত্রণ হয়েছিল, কিন্তু পরে তাঁকে বাদ দেওয়া হয় এই বলে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাঁর কোন প্রভাব নাই, কাজেই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হবার তাঁর যোগ্যতা নাই। বৃটীশ রাজনৈতিকদের মুখের কথা ছিল এই, কিন্তু জিন্না সাহেবকে বাদ দেওয়ার আসল কারণ অন্য। ইংরেজের হাত থেকে ভারতীয়ের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করেছিলেন বলেই যে তাঁকে আর পরে নিমন্ত্রণ করা হয়নি একথা নিঃসন্দেহ। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে লণ্ডনের টাইমস পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে স্পষ্টভাবেই বলেছিল যে সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র জিন্না সাহেবের কণ্ঠই বেসুর বাজছে। ইংরেজের কানে সেদিন জিন্না সাহেবের দাবী বেসুর বাজবে, এটা স্বাভাবিক। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করেনি—যারা গিয়েছিলেন সকলেই নরমপন্থী নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

এ সময়ে ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক কর্ম্ম প্রক্রিয়ায় তিনটা দার স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দলে ছিলেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি। তাঁরা পূর্ব্বাপর ইংরেজের মুখাপেক্ষী এবং ইংরেজের অনুগ্রহেই তাঁদের পুষ্টি। স্যর ফজলি হোসেন এবং স্যর মহম্মদ শফীর নেতৃত্বে তাঁরা শাসনতন্ত্রে যোগ দিয়ে মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি পদ অধিকার করেছিলেন। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগ ছিল না বটে, কিন্তু চাকরী প্রভৃতি নানা রকমের পৃষ্ঠপোষকতা হাতে থাকায় সাধারণের

উপর খানিকটা কর্ত্তৃত্ব করতে তাঁরা পারতেন। দ্বিতীয় দলে ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। তাঁরা কংগ্রেসের সদস্য অথবা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিভাশালী লোকও তাঁদের মধ্যে কম নয়, কিন্তু ১৯৩২ সালের পরে কংগ্রেসের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া এবং ইংরেজের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে সর্ব্বত্র যে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, তার ফলে তাঁদের কর্ম্মশক্তি অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁদের বেলায়ও জনমানসের সঙ্গে সংযোগ গভীর হতে পারেনি, এবং এ ব্যাপারে কংগ্রেসের দুর্ব্বলতা তাঁদের আরো দুর্ব্বল করেছে। একমাত্র বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও গুজরাট ভিন্ন অন্য কোথাও কংগ্রেস জনসাধারণের মধ্যে শিকড় মেলতে পারেনি, এবং ফলে গণসংগঠন অপেক্ষা গণ-আবেগের ভিত্তিতেই কংগ্রেসের শক্তি গড়ে উঠেছিল। আবেগের প্রাবল্যে কিন্তু আশঙ্কা রয়েছে, কারণ প্রবল আবেগের প্রতিক্রিয়াও প্রবল হতে বাধ্য। হিন্দু জনসাধারণের বেলায় তাতে তত বেশী ক্ষতি হয়নি, কারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিক ঝোঁকও কংগ্রেসের দিকে। তাই সঙ্কটের দিনেও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনমানসকে কংগ্রেসের পথে টেনেছে, এবং অনেকখানি সফল হয়েছে। মুসলমান মধ্যবিত্তের বেলা ঘটনাসংস্থানে তাদের অধিকাংশই সরকারের অনুগ্রহপ্রত্যাশী। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পরে ভারতীয় মুসলমানের যে ভাগ্যবিপর্য্যয়, সে আঘাত আজো সমাজ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেনি। স্যর সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ভাঙা কপাল জোড়া দেবার যে চেষ্টার সুরু, ১৯০৬ সালে লীগ প্রতিষ্ঠায় তারই দ্বিতীয় স্তর। আজো তাই মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিপুল অংশ সংগ্রামবিমুখ ও সরকার-সমর্থক। ফলে মুসলমানের মধ্যে যারা কংগ্রেসপন্থী, জনসাধারণের সমর্থনের অভাবে তারা যে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, এবং সমস্ত কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করে ফেলবে, তাতে বিচিত্র কি?

মুসলমানের মধ্যে একটী তৃতীয় দলের বিকাশও এই সময়েই দেখা দিতে সুরু করে। কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থাকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমে তাঁরা তুষ্ট হতে পারেন নি। বলেছেন যে সে কার্য্যক্রম যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর ও ভবিষ্যৎপন্থী নয়। অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীর কাঠামোকে দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত দলের সৃষ্টি, তাদের মধ্যে বাঙলায় কৃষক-প্রজাসমিতি ও পাঞ্জাবে আহরার দল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবস্থাপন্ন কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ভিত্তি করেই আহরার দলের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে মুসলমানের মধ্যেই আহরার আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। আর্থিক বিক্ষোভ ও ধর্ম্মোন্মাদনার মিলনে আহরারদের মধ্যেও বিপ্লবী সম্ভাবনা প্রচুর। বাঙলায় প্রজাসমিতি যে কেবলমাত্র কৃষকের ছোট খাট অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত তা নয়। ১৯৩০—৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরে মুসলমান কর্ম্মীদের মনে যে সব প্রশ্ন ও সমস্যা উঠে, তার ফলেই কৃষক-প্রজা আন্দোলনের জন্ম। কংগ্রেসের প্রতি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক ঝোঁক এবং তার ফলাফল বাঙলায় যত পরিষ্কার ভাবে ধরা দিয়েছে, অন্যত্র তার নিদর্শন মেলে না; এবং সেইজন্য কৃষিজীবী জন-সাধারণের সঙ্গে প্রায় সম্বন্ধমুক্ত হয়েও বাঙলায় কংগ্রেস সক্রিয়, সবল ও শক্তিশালী। কিন্তু বাঙলার জনসাধারণের অধিকাংশই মুসলমান, এবং মুসলমানের অধিকাংশ কৃষিজীবী ও গ্রামবাসী। সেইজন্য কংগ্রেস যখন সক্রিয় গণ-আন্দোলনের দিকে ঝুঁকল, তখন হুগলী, মেদিনীপুর অথবা ত্রিপুরা, এরকম গুটিকটা স্থান ভিন্ন অন্যত্র সে আন্দোলন আশানুরূপ শক্তি লাভ করেনি। এই ঘটনা সংস্থানের সঙ্গে

মিলেছিল বাঙলার চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত। তার ফলে বঞ্চিত ও নিরন্ন কৃষক বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে দেশীয় জনসাধারণের স্বার্থসংঘাত স্পষ্টভাবে দেখেনি—তার চোখে তীব্র ভাবে ধরা পড়েছে ধনিক ও জমিদারের দ্বারা জনসাধারণের শোষণ ও নিষ্পেষণ। বাঙলার ঐতিহাসিক বিবর্তনে বিত্তশালী শ্রেণীর অধিকাংশ হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণের বিপুল অংশ কৃষক মজুর হওয়ায় সে স্বার্থসংঘাতকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়াও সহজ হয়েছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভয়াবহ রূপ জনসাধারণের কাছে ধরা দেয়নি. সাম্প্রদায়িক ও লক্ষ্যহীন শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যে জনমানসের শক্তি নিষ্ফল ভাবে অপব্যয় হয়েছে। রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনে তাই মুসলমান কর্ম্মী ও চিন্তানায়কদের সাধনার কৃষকপ্রজা আন্দোলনের জন্ম. কিন্তু মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও কৃষকপ্রজা আন্দোলন লক্ষ্য ও প্রকৃতিতে অসাম্প্রদায়িক, এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের শোষিত জনসাধারণেরই এ আন্দোলনে স্থান আছে।

আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পরেও পূর্ব্বের তিনটী মত ও দলের পরিচয় মুসলমান সমাজে মেলে—সেখানে মুসলীম লীগের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন। জিন্না সাহেব অবশ্য লীগের পুনরুজ্জীবনের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বারবার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনিও হতাশ হয়ে পড়েন। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ভারতীয় রাজনীতির সংস্রব ছেড়ে তিনি বিলেতে গিয়ে আইন ব্যবসায়ে মন দেওয়া স্থির করলেন। তাতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই—কারণ সে সময়ে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জিন্না সাহেবের মতন নিঃসঙ্গ ও একক বোধ হয় দ্বিতীয় কেউ ছিল না। একপক্ষে নরমপন্থী সরকার-ঘেঁষা দলের সঙ্গে তাঁর বনত না কারণ কংগ্রেসের বাইরে থেকেও তখনও তাঁর মেজাজ প্রায়

ষোল আনা কংগ্রেসী। একমাত্র সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ আন্দোলন নিয়েই তো তাঁর কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কংগ্রেসের সমস্ত বা সহযোগী বলে তাঁদের সঙ্গেও তিনি মিলতে পারলেন না। আর কৃষক প্রজা বা আহরার প্রভৃতি অর্থনৈতিক আন্দোলনের তো কথাই নাই। জিন্না সাহেব কায়েমী স্বার্থেরই প্রতিনিধি, তাই জনস্বার্থের আদর্শে অনুপ্রাণিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম তাঁর চোখে একেবারে বলশেভিজমের নিশানা বলে মনে হয়েছে। সমস্ত দল ছাড়া হল। তাই জিন্না সাহেবও রাজনীতির পিচ্ছিল পথ ছেড়ে আইনের স্বচ্ছন্দ পথে যাত্রা সুরু করলেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য রকম। কোথায় সুদূর বিলাতে নির্বাসন আর কোথায় রাজনৈতিক ধ্বংসের পরিবর্তে মুসলমান সমাজের এক বিপুল অংশের "কায়েদে আজমের" লোভনীয় সম্মান। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী যে কত কঠিন, জিন্না সাহেবের ভাগ্যবিপর্যয় থেকেই তা বোঝা যায়। লীগের ভবিষ্যৎ যখন একেবারে অন্ধকার মনে হচ্ছিল, তখনই হঠাৎ ঘটনার আকস্মিক বিবর্তনে লীগের এমন প্রতিষ্ঠা হল যে পূর্বে কোনদিন কেউ তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ঘটনাগুলিও এমন যে তার উপর জিন্না সাহেব বা লীগের কর্মকর্তাদের কারু কোন হাত ছিল না। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠাশালী সর্বভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের অনেকেই মারা গেলেন, এবং তাঁদের স্থান নিতে পারেন, জিন্না সাহেব ছাড়া এমন আর কেউ রইলেন না। হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৮ সালে। কংগ্রেসের মুসলমান নেতাদের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল অনন্যসাধারণ এবং তাঁর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হল, সহজে তা পূরল না। মৌলানা মোহাম্মদ আলী গোলটেবিল বৈঠকের আমলে বিদেশেই মারা গেলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে আর ফিরবেন না বলে

তাঁর যে সঙ্কল্প, সে সঙ্কল্প এমনিভাবে পূর্ণ হল। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর মত সর্ব্বজনপ্রিয় নেতার প্রয়োজন খুবই বেশী। কংগ্রেসী রাজনীতি থেকে অবশ্য তিনি খানিকটা সরে এসেছিলেন, কিন্তু তবু তিনি চরমপন্থী, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্তসমর্পিত যোদ্ধা বলে তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষতি অপরিমেয়। জাতীয়তাবাদী মুসলমানের দুর্ভাগ্যের পশরা পূর্ণ হল ডাক্তার আনসারীর অকাল মৃত্যুতে। তার আজীবন সাধনা ছিল মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় অনুভূতি ও সাধনার উদ্বোধন এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ততটা সুবিধা করতে পারেনি। অপূর্ব্ব মনীষা, ত্যাগ ও সাধনা সত্বেও মওলানা আবুল কালাম আজাদ এঁদের অভাব পূরণ করতে পারলেন না। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনিই ভারতীয় মুসলমানকে নতুন পথের নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু প্রতিভার দূরদৃষ্টিতে তিনি যে লক্ষ্য ও পথ দেখেছিলেন, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ততদূর পৌছয়না। মওলানা আজাদ তাই চিরদিনই রাষ্ট্রনেতাদের গুরু— তাঁর প্রকৃতি ও পাণ্ডিত্য তাঁকে জনসাধারণের গণনেতা হতে দেয়নি। আমরা দেখেছি যে মুসলমান মধ্যবিত্তকে কংগ্রেস টানতে পারেনি, তাই উপযুক্ত সহকারীর অভাবে মওলানা আজাদের বিপ্লবী আহ্বান জনসাধারণের কাছে অপরিচিত রয়ে গেল। মধ্যপন্থী সরকার-মুখাপেক্ষী দলগুলির নেতৃবৃন্দের মধ্যে কর্ম্মশক্তিতে স্যর ফজলী হোসেন ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্যর মহম্মদ শফীর প্রভাব প্রতিপত্তিও কম ছিল না, কিন্তু তাঁরা দুজনেই কয়েক বৎসরের মধ্যে মারা যাওয়ায় মধ্যপন্থী দলেও সর্ব্বভারতীয় নেতা কেউ রইলেন না। স্যর সিকন্দার হায়াৎ খাঁর রাজনীতি ক্ষেত্রে অভ্যুদয় এই সময়ে, কিন্তু তখনও সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বলাভের মতন প্রতিষ্ঠা বা যশ তাঁর হয়নি। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে

গঠিত দলগুলির তখনো ভাল করে দানা বাঁধেনি। বাঙলাদেশে প্রজা আন্দোলনের নেতা ফজলুল হক বক্তা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর এবং রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণেও কুশলী। নেতৃত্বের অনেক গুণ তাঁর ছিল কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ সত্বেও চরিত্রের স্থৈর্য্যের অভাবে তিনি তাঁর সদ্‌গুণের পুরো ব্যবহার করতে পারেন নি। তাছাড়া প্রজা আন্দোলনের তখনো এত শক্তি হয়নি যে সে আন্দোলনের ভিত্তিতে তিনি সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব অধিকার করতে পারেন। আহরার দলের বেলায় একথা আরো বেশী খাটে, এবং খাকসার আন্দোলনের তখন সবেমাত্র সুরু। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে জিন্না সাহেবের আর প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না, এবং সুযোগ বুঝে তিনি পূর্ব্বের সঙ্কল্প ত্যাগ করে অবিলম্বে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর নেতৃত্বে আবার লীগের নতুন সংগঠন সুরু হল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ১৯৩৬—৩৭ সালে সাধারণ নির্ব্বাচন হল। জিন্না সাহেব তারই সুযোগ নিয়ে লীগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সমগ্র নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল যে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতাকামীদের নিয়েই তিনি লীগ গঠন করবেন। সেজন্য লীগের কর্ম্মসূচী ও উদ্দেশ্যেরও সংশোধন করা হল কিন্তু পুরোনো পেটরায় নতুন গয়না মানায় না। জিন্না সাহেবের কাছে যা চরম ও প্রগতিশীল মনে হল, সক্রিয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা যাঁদের ছিল, তাঁদের কাছে তাই মনে হল একেবারে জোলো ও অর্থহীন। ভারতীয় রাজনৈতিক সত্তা যে কুড়ি বৎসরে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তাও জিন্না সাহেব বুঝলেন না, এবং আইনজীবীর মনের যে স্বাভাবিক গোঁড়ামি, তার ফলে কোন বিপ্লবী কার্য্যক্রম গ্রহণ করা লীগের পক্ষে সম্ভব হল না। যুক্ত প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্ন রকম বলে সেখানকার মুসলমান জিন্না সাহেবের ডাকে সাড়া

দিল। সেখানকার মুসলমান সংখ্যায় লঘু এবং তাদের মধ্যে অনেকেই জমিদার ও বিত্তশালী। অন্যান্য প্রদেশে এবং বিশেষ করে মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিতে অবস্থা অন্যরূপ। মুসলমান সেখানে নিপীড়িত ও বিত্তহীন, তাই সমাজের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থারক্ষার ভিত্তিতে সংগঠিত লীগের কার্য্যক্রম তাদের আকর্ষণ করল না। এ সমস্ত প্রদেশে তাই বিত্তশালী প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক বণিক জমিদারের দলই লীগের আহ্বানে সাড়া দিল। বাঙলায় প্রজা-লীগের নির্ব্বাচন সংগ্রামে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা ধ্বংস ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নিয়েই দ্বন্দ্ব বাধল। লীগ চাইল পুরোনো প্রথার সংরক্ষণ, প্রজা আন্দোলনের লক্ষ্য হল পুরাতন সমাজ-সংগঠন ধ্বংস করে আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা।

নির্ব্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, নির্ব্বাচনের আন্দোলনেই জনশিক্ষা অনেকখানি এগিয়ে গেল। নির্ব্বাচনের ফলও মোটের উপর সর্ব্বত্রই আশাপ্রদ মনে হল। আইনসভাগুলির সংগঠনে সর্ব্বত্রই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের পরাজয়ে দেশের শাসন সংস্কারের আশা প্রবল হয়ে উঠল। হিন্দু নির্ব্বাচকদের তো কথাই নাই, কংগ্রেসের জয়জয়কারে পুরোনো সরকার-ঘেঁষা পাণ্ডাদের চিহ্ন প্রায় লুপ্ত হয়ে এল। মুসলমানদের মধ্যেও সর্ব্বত্রই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ধ্বংস না হলেও পরাজয় হল। বাঙলার লীগনেতা প্রজা-আন্দোলনের নেতার কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ায় বাঙলাদেশে কায়েমী স্বার্থের বনিয়াদে গড়া লীগের ভিত্তি টলে উঠল। পাঞ্জাবেও লীগের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে স্যর সেকেন্দারের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান মধ্যপন্থীদের সংগঠন জয়যুক্ত হল। একমাত্র যুক্ত প্রদেশেই লীগের খানিকটা সাফল্য দেখা যায় কিন্তু তাকেও প্রগতিপন্থীদের জয় বলতে হয়, কারণ সেখানে

লীগের বিরুদ্ধে ছিল ছত্তারীর নওয়াবের নেতৃত্বে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দল। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সামনে লীগ দাঁড়াতে পারেনি। সিন্ধু প্রদেশেও লীগ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। এক কথায় ভারতবর্ষের সর্বত্রই নতুন আদর্শ ও নতুন শক্তির জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল—মনে হ'ল যে মুসলমান ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির সম্মেলনে ভারতবর্ষের নবযুগের সূচনা হবে।

ভারতের সৌভাগ্যের দিন এত সহজে আসবার নয়। প্রগতিপন্থীদের সহযোগিতায় নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন সম্ভব হল না। যে শাসনতন্ত্র ১৯৩৭ সালে এদেশে প্রবর্তিত হল, তার প্রায় সবখানিই ফাঁকি। পরাধীন জাতিকে এ রকম নিষ্ঠুরভাবে প্রতারণার তুলনা ইতিহাসে বেশী মেলে না। কাজেই কংগ্রেস যে এ ভুয়ো শাসনতন্ত্র বর্জন করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ক্ষমতা নেই অথচ দায়িত্ব আছে—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের এ রকম পরিহাস সহ্য করাও কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ না করে বোধ হয় ভুল করল। শাসনতন্ত্র ধ্বংসের দিক দিয়েও মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মূল্য ছিল, কারণ বাস্তব রাজনীতির রীতিই হল যে যেটুকু ক্ষমতা পাওয়া যায়, তা দখল করে আরো ক্ষমতা লাভের জন্য সাধনা। অবশ্য পার্লামেন্টারী রাজনীতি বাদ দিলে আর মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না, এবং তাহলে সংগঠন ও আন্দোলনমূলক কাজে পুরোপুরি ঝোঁক দেওয়া চলে। কিন্তু পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে যোগ দিয়ে মন্ত্রিত্ববর্জনের বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না, এবং সেজন্য কংগ্রেস যে পথ অবলম্বন করল, তাতে দুটো অলটারনেটিভেরই অসুবিধা ভোগ করতে হল অথচ কোনোটারই সুবিধা পাওয়া গেল না। মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কাজে লাটসাহেব বাধা দেবে না এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের অনেক চেষ্টা হল, কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে

সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। বড়লাটের ভাষা হয় তো পূর্ব্বের চেয়ে মোলায়েম হয়ে এল কিন্তু কংগ্রেসের দাবীর সারমর্ম্ম স্বীকৃত হল না। তা সত্ত্বেও অনেক দ্বিধা ও বাদানুবাদের পরে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব মঞ্জুর করে নিল। প্রথমে স্থির হল যে, যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক্য, কেবলমাত্র সেই সমস্ত প্রদেশেই মন্ত্রিত্ব নেওয়া হবে। পরে স্থির হল যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দল হলেও মন্ত্রিত্ব নেওয়া চলবে, এবং শেষে চেষ্টা হল যে দল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাই হোক না কেন, যেখানেই সম্ভব, সেখানেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব অধিকারের চেষ্টা করবে। সকল অবস্থায় সকল সর্ত্তে নামঞ্জুর থেকে এমনিভাবে যেমন করে হোক এবং যে কোন সর্ত্তে মঞ্জুরীতে কংগ্রেসের নীতি আমূল বদলে গেল বটে, কিন্তু কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীর এ পরিবর্ত্তনে বড় দেরী হয়ে পড়ল —পূর্ব্বের সে শুভমুহূর্ত্ত আর মিলল না।

২

কংগ্রেসের এ দ্বিধার ফল ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মারাত্মক। তাতে যে কেবল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা ও মতদ্বৈধ প্রকাশ পেল তা নয়, অন্যান্য প্রগতিপন্থী দলের সহায়তায় প্রাদেশিক শক্তিকেন্দ্র দখলের সুযোগও চলে গেল। বাঙলা দেশের কৃষকপ্রজা আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্বন্ধ ও সহযোগিতা স্বাভাবিক, কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের ঐকান্তিক আবেদন সত্ত্বেও বাঙলার কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় মন্ত্রিত্বগঠন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর সহায়তার অঙ্গীকার দিতে পারল না। মন্ত্রিত্বের প্রয়োজনে মুসলীম লীগের সঙ্গে তাঁর আবার সমঝোতা হল, এবং লীগে যোগদানের পরে লীগের মর্য্যাদা ও শক্তি বাড়াবার কৃতিত্বের অনেকখানিই তাঁর। জনসাধারণের সঙ্গে লীগের পূর্ব্বে যোগ ছিল না বল্লেই চলে, সে গণসংযোগ স্থাপনও ফজলুল হকের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। স্যার সেকেন্দারও অবস্থাগতিকে লীগের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী, কিন্তু কংগ্রেসের সহযোগিতা না পেয়ে তিনিও ক্রমে প্রগতিবিরোধী দক্ষিণ-পন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের পরে যে ছবি ফুটে উঠেছিল, প্রগতিশীল শক্তির সর্ব্বত্রই বিজয়ের যে

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার বদলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠল।

কয়েকমাস পরে কংগ্রেস কতকগুলি প্রদেশে শাসনভার গ্রহণ করল. কিন্তু যে সুযোগ একবার মিলেছিল, তা আর ফিরল না। ততদিনে প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলিও প্রথম পরাজয়ের পরে আবার দানা বাধতে সময় পেয়েছে। তাছাড়া অভিজ্ঞতার অভাব এবং অন্যান্য কারণেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে কংগ্রেস কয়েকটি গুরুতর ভুল করে বসল। মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসের ভাগী হতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র মুসলীম লীগের পরাজয়ে কংগ্রেস তাতে রাজী হয়নি। সেজন্য লীগনেতাদের রাগ ছিলই, এখন কংগ্রেসের ভুলের সুযোগ নিয়ে মুসলীম লীগ আবার জেগে উঠল। লীগের অভিযোগ বহু এবং ব্যাপক. কিন্তু তার মধ্যে ধর্ম্ম, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চারটা অভিযোগই প্রবলভাবে প্রচারিত হল। লীগ বলল যে কংগ্রেস মুসলমানের ধর্ম্মে বাধা দিতে চায়, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চায়, চাকুরী ও আইনসভায় উপযুক্ত অংশ দেয় না এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অপমান করে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা অভিযোগগুলিকে অস্বীকার করেছে, এবং যে সমস্ত কথা ও কাজকে ভিত্তি করে অভিযোগ আনা হয়েছে, তারও ভিন্ন বিবরণ দিয়েছে। মন্ত্রিদের এ অস্বীকার গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁদের কথাকেও অবহেলা করা চলেনা, কিন্তু তবু একথাও সত্য যে মুসলমান জনসাধারণের মনে এ অভিযোগগুলি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক দলের কারসাজিতে তিলকে তাল করা যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য অন্ততঃ তিল থাকা চাই। জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল বলেই মুসলীম লীগের প্রচারকার্য্যও এত সত্বর সফল হয়েছে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে লীগমনোবৃত্তি যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল,

ইকবাল শিক্ষার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, ওয়ার্ধা স্কীমকে তারই কার্য্যকরী রূপ বলা চলে। এ পরিকল্পনার মূল কথাই হল মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষের সমন্বয় এবং কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞানে তুষ্ট না থেকে সংসারজ্ঞানের দিকে শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ। আমাদের দেশে শিক্ষার গলদও এইখানে। কেবলমাত্র ভাষাশিক্ষার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়ায় করকৌশলের বিকাশ হয় না এবং তার ফলে আমাদের দেশে শিক্ষিতের অধিকাংশই সংসার কার্য্যে একান্ত অপটু। ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমাজ, শিক্ষা অথবা যে কোন সংস্কারের পথেই বড় সঙ্কট। নব জীবনের প্রেরণা যে কখন অজ্ঞাতে পুরাতনের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় রূপান্তরিত হয় তার হদিসও মেলে না, অথচ সে রূপান্তরের ফলে পুরাতন অবিশ্বাস, সন্দেহ ও সংঘর্ষ নতুন করে জেগে উঠে। ওয়ার্ধা স্কীমেও এ রকম অবান্তর আপত্তি এসে জুটল। কংগ্রেসের হিন্দু সমর্থকদের মধ্যে অনেকে চেষ্টা করল যে যে শিক্ষা-পরিকল্পনা হিন্দুধর্ম্মমূলক ঐতিহ্যের বাহন হোক। মুসলমানদের আপত্তি তাতে দানা বাঁধবার আরো সুযোগ পেল। ধর্ম্মের আবহাওয়া শিক্ষার মধ্যে আনলে ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা যে হিন্দু সংস্কার ঘেঁষা হবে এটা অনিবার্য্য। ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভয় হল, যে সংস্কৃতি তাদের সৃষ্টি এবং তারা যে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত, তা ধ্বংস হয়ে যাবে। মুসলীম লীগ ওয়ার্ধা স্কীমের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করল, তাতে তার দোষগুণের কথা চাপা পড়ে গেল। এ সম্বন্ধে কংগ্রেসেরও খানিকটা দুর্ব্বলতা ছিল। যে দেশে বিচিত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাস, সেখানে রাষ্ট্রপরিচালিত শিক্ষাপ্রণালীতে ধর্ম্ম না আনাই ভাল। কামাল আতাতুর্ক এ কথা বুঝেছিলেন বলেই তুরস্কের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে পার্থিব এবং ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ। ভারতীয় মুসলমান কামাল আতাতুর্কের

নামে মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু কামালের শিক্ষা অথবা কম্ম ধারার এ দেশে প্রয়োগে তাদের ঘোরতর আপত্তি।

ভারতের রাষ্ট্র ভাষা নিয়েও ঝগড়া কম হয়নি। এখানেও সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের মনে ভয় যে পাছে ফাঁকি দিয়ে তাদের ঘাড়ে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়। সংস্কৃতির যে সম্প্রদায়গত রূপ নাই, দেশ-কালজ রূপই তার একমাত্র রূপ এবং জীবন্ত সংস্কৃতি সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য একথা পরপদানত আত্মবিস্মৃত সম্প্রদায়ের স্মরণে থাকে না। সেজন্য ভারতের হিন্দু ভুলে যায় যে হিন্দু সভ্যতার গৌরবের দিনে তাই ছিল বিশ্বসভ্যতার বাহন। ভারতের মুসলমানও ভুলে যায় যে মুসলমান সংস্কৃতির যে দিন শ্রেষ্ঠ বিকাশ, সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র প্রভাব ও ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে তাই ছিল বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক ও আদর্শ। উর্দ্দু হিন্দীর ঝগড়া এই আত্ম-বিস্মরণেরই ফল। মূলত উর্দ্দু ও হিন্দী একই ভাষা তাদের ব্যাকরণ ও শব্দপ্রকরণ এক। তফাৎ কেবল দুটা। আরবী ফারসীর তুলনায় সংস্কৃত কথার অনুপাত হিন্দীতে বেশী, উর্দ্দুতে কম। আর ভিন্ন হরফে উর্দ্দু ও হিন্দী লেখা হয়। কংগ্রেসের মধ্যেও অনেকে এ ঝগড়া মেটাতে বললেন যে বাইরের থেকে রোমান হরফ নিলে হিন্দুমুসলমান কারু কিছু বলবার থাকেনা। রোমান হরফে লেখা পড়া সোজা, তুর্কীরাও তা গ্রহণ করেছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তার চল। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনেও তা সহায়তা করবে। কংগ্রেসের মধ্যে প্রাচীন পন্থীদের এ ব্যবস্থা পছন্দ হল না। প্রাচীন যুগধর্ম্মী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন যাদের লক্ষ্য, তারা রোমান হরফ গ্রহণে আপত্তি করবে এ সহজেই বোঝা যায়। দুই দলকেই খুসী করতে স্থির হল যে নাগরী ও ফারসী দু হরফই চলবে, কিন্তু

হিন্দুমুসলমান কেউ তাতে সন্তুষ্ট হলনা। মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি হল এই যে নামে দু হরফ চললেও কার্য্যত নাগরীর চাপে ফারসী লুপ্ত হয়ে যাবে। সেটা খানিকটা অনিবার্য্য, কারণ যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু, সেখানে তারা সংখ্যায় এতই কম যে নিজেদের দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনেই তারা নাগরী হরফ শিখতে বাধ্য হয়। ফলে হয় দু হরফ শেখার বোঝায় তাদের মানসিক উৎকর্ষে বাধা আসে, তা নইলে ফারসী ও নাগরী হরফের মধ্যে একটা ছাড়তে বাধ্য হয়ে পড়ে।

সামাজিক ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িক কলহের অন্যতম প্রধান কারণ। সমস্ত অহিন্দুর প্রতিই গোঁড়া হিন্দুর খানিকটা অবজ্ঞা এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধান্তরের পশ্চাদপটে সে অবজ্ঞা মুসলমানের বেলা আরো গভীর। মুসলমানের মনেও তার জন্য বিক্ষোভ তীক্ষ্ণতর। একেইতো ব্যষ্টিক বা অর্থনৈতিক অবিচারের তুলনায় সামাজিক অবিচার অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, এবং তার প্রতিক্রিয়া প্রবলতর। সামাজিক অন্যায়ের মূলেও হয়ত অর্থনৈতিক ব রাজনৈতিক অসাম্য, কিন্তু তবু সংঘর্ষের ভিত্তির চেয়ে সংঘর্ষের বহিপ্রকাশেই বিপদ বেশী। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা মুসলমানের চোখে কেবলমাত্র সামাজিক সংকীর্ণতা ও দম্ভ, এবং তার বিরুদ্ধে আক্রোশ স্বাভাবিক। আধুনিক অবস্থায় সমাজের পুরাতন কাঠামো টিকবে কিনা সন্দেহ। যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং মোটরবাস ও রেলপথের প্রভাবে গ্রামের দূরত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ ও অন্যান্য অনেক পুরোনো সংস্কারও ভাঙবে, কিন্তু যতদিন তা না ভাঙছে, ততদিন হিন্দু সমাজের ছুঁৎমার্গের ফলে দ্বন্দ্বসংঘর্ষের ক্ষেত্র তৈরী থাকবেই।

মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সংঘর্ষের সর্ব্বপ্রধান কারণ কিন্তু চাকুরী ও আইন সভায় আসন ভাগাভাগি নিয়ে। রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহারও

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং সেজন্য বর্তমান ভারতবর্ষের সঙ্কুচিত ও দরিদ্র জীবনই এই সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ। দেশে যেদিন ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সরকারী এবং বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকেই ইংরেজ ঝুঁকেছিল। ফলে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমান পিছিয়ে পড়ে। এবং গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে তার প্রতিকারই মুসলমান নেতাদের একমাত্র লক্ষ্য। দেশের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় চাকরীর গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে এবং আজ যে চাকরী নিয়ে সাম্প্রদায়িক কোন্দল, তার মূলে রয়েছে দেশের আর্থিক দুর্গতি। চাকরীর অনুপাত নির্দেশ ও অর্থনৈতিক কর্মপন্থা নির্ণয় আইন সভার অধিকার এবং সেজন্যই আইন সভার প্রতিনিধি সংখ্যা নিয়ে ঝগড়া তলিয়ে দেখলে তাই সন্দেহ থাকেনা যে ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, তা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তি ও সুবিধা নিয়ে ঝগড়া ভিন্ন কিছুই নয়। বাংলা দেশে প্রায় দেড়শো বৎসর হিন্দু মধ্যবিত্তের ভাগেই সমাজের ক্ষীর সর জুটেছে, নবগঠিত মুসলমান মধ্যবিত্ত তার ভাগ চায় এবং হিন্দু আপত্তি করে বলেই বাংলায় বর্তমানে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে তারই উল্টো দিক দেখি। সেখানে মুসলমান মধ্যবিত্ত কায়েমী স্বার্থরক্ষা করতে চায়। সেই কায়েমী স্বার্থের ভাগ নেওয়া হিন্দুর চেষ্টা। সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণশক্তির ব্যবহারে আপন উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। জনসাধারণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তারও মূলে তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একবার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবিকা ও ক্ষমতার সমস্যার সমাধান হলে তাই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মূল কারণ অন্তর্হিত হবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার আসল কারণ মনে থাকলে লীগের অভিযোগের এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে তার উত্তরের তাৎপর্য বোঝা যায়।

লীগের তরফ থেকে তিলকে তাল করবার চেষ্টা স্বাভাবিক। সেই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব ব্যক্তির বা শ্রেণী বিশেষের, তাদেরও সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সমস্যা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে থাকা চলে, কংগ্রেস তারই চেষ্টা করেছে। সব দেশেই আত্মীয়-প্রীতিজনিত পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত মেলে—পরাধীন দেশে তার প্রকোপ আরো বেশী। ভারতবর্ষের মতন বিপুল দেশে তাই এ রকম পক্ষপাতের অনেক নমুনা মিলবে। কেবলমাত্র কংগ্রেসী প্রদেশ নিয়ে লীগ মাতামাতি করেছে কিন্তু বাঙলা ও পঞ্জাবেও এরকম অবিচার দেখার হয়েছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু বলে মুসলীম লীগ সে পক্ষপাতকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে পেরেছে। কংগ্রেসের বিপুল বিজয়ে কংগ্রেসপন্থী জনসাধারণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যে শক্তির অপব্যবহার হবে, তাও অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আস্ফালনকে মুসলমান স্বার্থের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে চালাতেও লীগ দ্বিধা করেনি। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ভুলও হয়েছে এবং অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর পক্ষে ভুল করা বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই ভুলকে ফাঁপিয়ে বড় করে কংগ্রেসকে বিব্রত ও অপদস্থ করবার সুযোগ লীগ মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়েনি। বাঙলা দেশে লীগপন্থী মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর আমলেও গো-কোরবাণী আইন করে বন্ধ হয়েছে কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি শোনা যায় নি। অন্যপক্ষে কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে মহাজন ও জমিদারের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে যে সমস্ত আইন হয়েছে, তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ শোনা যায় নি। কিন্তু বাঙলার মন্ত্রিসভা যখনই কায়েমী স্বার্থে হাত দিয়েছে, বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে সরোষে গর্জ্জন করে উঠেছে। এ সমস্ত বাদবিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব যে মূলত রাজনৈতিক, শহীদগঞ্জের পরে সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রায় ৩০ জন খাকসার পুলীশের গুলি চালনায় প্রাণ দিল, অথচ সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে

মুসলমানের ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠবার আগেই মিলিয়ে গেল। লীগ-সদস্য মুসলমান প্রধান মন্ত্রী না হয়ে যদি সেখানে কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীর আদেশে এরকম দুর্ঘটনা ঘটত, তবে কি শহীদগঞ্জের মামলা এত সহজে মিটত?

৬

মুসলমান ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জীবিকা ও ক্ষমতার ভাগাভাগিই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ, কিন্তু প্রায় সকল দেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনসাধারণকে চালনা করে বলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যাগুলিই সমাজের বড় সমস্যা বলে মনে হয়। এ রকম দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাও বেড়ে যায়, এবং একথা স্বীকার করতেই হবে যে মুসলমান গণমানসের স্বচ্ছ চেতনার জন্যই সম্প্রতি লীগের প্রভাব এতখানি বেড়েছে। গত কুড়ি পঁচিশ বৎসরের ভাগ্যবিপর্যয়ে মুসলমান জনসাধারণের যে নবজাগরণ, তার শক্তি ও উদ্যমকে ভারতীয় কংগ্রেস এখনো কোন সংগঠনী খাদে আনতে পারে নি। নবজাগ্রত গণচেতনার পক্ষে নিছক রাজনৈতিকের চেয়ে ধর্ম্মমিশ্রিত আহ্বানের আবেদন ঢের বেশী, তাই কংগ্রেসের ইতিহাসেও এ রকম আবেদনের পরিচয় মেলে। সেই ধর্ম্মীয় খোলস ব্যবহার করেই লীগ মুসলমান জনসাধারণকে টানবার চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে। তার ফলে কেবল যে লীগের রাজনৈতিক প্রভাব আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গিয়েছে, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মুসলীম লীগের সংগঠন ও প্রকৃতিরও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরে কংগ্রেস যে পরিমাণে সক্রিয় আন্দোলন বাদ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, ঠিক সেই পরিমাণে লীগ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর উঁচু করে তুলছিল। তার ফলে লীগের ক্ষমতা ও খ্যাতির দুই-ই অত্যন্ত বেড়ে গেল। লীগের ক্রিয়া-কর্মে শৃঙ্খলা অবশ্য বাড়ে নি বরং ভীষণভাবে কমেছে, কিন্তু লীগের আভ্যন্তরীণ সংগঠনে যে বিপ্লবকারী পরিবর্তন, এটাও তারই নিদর্শন। পূর্ব্বে লীগের বৈঠক ছিল অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত আশরাফ মুসলমানের আদবকায়দা দোরস্ত সখের মজলিস, সরকারী ও বিষয়সম্পত্তির গুরুতর কাজকর্ম শেষ করে সেখানে এসে দু চারটা নরম গরম বুলি ছেড়ে দেশ সেবার দাবী মেটানোর আড্ডা—আর এখন তা হয়ে দাঁড়াল রগচটা মধ্যবিত্ত মুসলমানের রাজনৈতিক আখাড়া, বহুদিনের রাজনৈতিক বঞ্চনার পরে রাষ্ট্রশক্তির সম্ভাবনার বিমোহনে সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও বিচার বাদ দিয়ে আশা, আশঙ্কা ও ক্রোধের লীলা-ক্ষেত্র। এ পরিবর্তন বিস্ময়কর কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর জিন্না সাহেবের ভাগ্যবিড়ম্বনা। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে কংগ্রেস যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সক্রিয় আন্দোলনে নামছিল, জনসাধারণের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যই তিনি সেখান থেকে পলায়ন করলেন, অথচ তার ললাটের লিখন যে তারই হাত দিয়ে পূর্ব্বেকার নিয়মতান্ত্রিক ও নরমপন্থী লীগ ধীরে ধীরে সংগ্রাম মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। তাও হল এমন সময় যখন কংগ্রেস সংগ্রাম ছেড়ে ক্রমে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকছে। মনে প্রাণে উকিল—জিন্না সাহেবের এই হল ঠিক পরিচয় এবং উকিল হিসাবে নিয়মতান্ত্রিকতা তার একেবারে মজ্জাগত। আইনসভাতে তাই তাঁর জুড়ি মেলা ভার—সেখানে আইনের মারপ্যাঁচের মধ্য থেকে ফাঁক বের করে তার পূর্ণ সুযোগ সুবিধা গ্রহণেই তাঁর আনন্দ। নিয়ম-

তান্ত্রিক ক্ষেত্রের বাইরে কিন্তু তিনি অসহায়। যে সব বিষয়ে আইনের ধারা কোন কথা বলে না, অথবা রাজনৈতিক সমস্যা যেখানে শক্তির উলঙ্গ দ্বন্দ্বে আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে আইনজীবী জিন্না আর কূল খুঁজে পান না। যে সব গুণের জন্য পার্লামেণ্টারী দলের নেতা হিসাবে তাঁর সাফল্য, সেই সমস্ত গুণই সংঘর্ষ ও সংকটের দিনে বিপ্লবী জনসাধারণের নেতৃত্বের বেলা দোষ হয়ে দাঁড়ায় বলে তিনি বিপ্লবী নেতা হবার একেবারে অযোগ্য। তাই এবার মহাযুদ্ধ যেদিন বাধল, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব বর্জ্জন করে আবার সংগ্রামশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ল, প্রত্যক্ষ ও বে-আইনী আন্দোলনের হাওয়া উঠ্‌ল, সে সময় আমরা দেখি যে লীগ তার পূর্ব্বের সমস্ত সংগ্রামশীলতার ভাণ বর্জ্জন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় ও তার অনুগ্রহের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র চালাবার জন্য উদগ্রীব।

তা সত্ত্বেও লীগের পরিবর্ত্তন হয়েছে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের মতন লীগও ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে। সে সময় লীগও বলেছিল যে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সমন্বয়ে স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত করতে হবে, কিন্তু সেদিনও কংগ্রেসের সঙ্গে কার্যক্রম নিয়ে লীগের মতভেদ ছিল। কংগ্রেস চেয়েছিল যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো গণপরিষদের দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে, কিন্তু লীগ তাতে রাজী হয়নি, বলেছে যে গণপরিষদে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মতামত কোন আমল পাবে না। ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলে ভাগ করবার প্রস্তাবও অনেকবার উঠেছে কিন্তু ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত লীগ এরকম কোন ভাগাভাগির প্রস্তাব গ্রাহ্য করেনি। ১৯৪০ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ইস্তফার কিছুদিন পরে লীগ হঠাৎ ঘোষণা করে বসল যে হিন্দু ও মুসলমান

প্রদেশগুলির জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। সে দুটী যুক্তরাষ্ট্রেও বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে লীগের এই দাবীতেই কিন্তু প্রমাণ হয় যে আসলে সমস্যার কোন সমাধানই হল না।

কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কৃষকপ্রজা সমস্ত দলেরই লক্ষ্য স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনা। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু বিবাদ অনেক। কংগ্রেস চায় যে স্বতন্ত্র ও স্বনিয়ন্ত্রণশীল প্রদেশসমূহের সংযোগে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে, তার হাতে দেশ রক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, যানবাহন ও চলাচল, শুল্ক ও মুদ্রার ভার থাকবে। বাকী সমস্ত ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাতে। লীগও চায় যে উল্লিখিত বিষয়গুলি যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকবে, কিন্তু লীগের পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র হবে দুটী, এবং তাদের কার্যক্রমকে পরিচালনা করবার জন্য কোন কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রকে স্বীকার করতে লীগ প্রস্তুত নয়। মহাসভার পরিকল্পনাকে লীগ পরিকল্পনার ঠিক উল্টো বলা চলে। বস্তুত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে নিলেও মহাসভার লক্ষ্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি, এবং তার ফলে যদি সংগঠনকারী রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হ্রাস হয়ে তারা স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত হয়, তবে তাতেও মহাসভার কোন আপত্তি নেই। কৃষকপ্রজা আন্দোলনের পরিকল্পনার সঙ্গে কংগ্রেসের পরিকল্পনার পার্থক্য দুইটী। স্বনিয়ন্ত্রণশীল প্রদেশের বদলে কৃষকপ্রজা আন্দোলন স্বাধীন খণ্ডরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি করতে চায়। তাছাড়া, কৃষকপ্রজা আন্দোলন স্বনিয়ন্ত্রণশীল ও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাধীন মিলন ও স্বতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে যে

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে মজুর ও চাষী অর্থাৎ দেশের অগণিত জনসাধারণের স্বার্থেই খণ্ড এবং যুক্ত উভয় রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এতদিন পরে হঠাৎ ১৯৪০ সালে ভারতীয় ঐক্য অস্বীকার করে লীগ দুই যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকল কেন? সংস্কৃতিগত বিলোপের আশঙ্কাই বোধ হয় লীগের এ মত পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ, যদিও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের আমলে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া থেকেই তার সূত্রপাত। হিন্দুদের মধ্যে একটা বিপুল অংশের গোঁড়ামীর ফলে লীগ প্রায় সমস্ত মুসলমান সমাজে এ আশঙ্কা সংক্রামিত করতে পেরেছিল। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ভারতের রাষ্ট্রিয় নবজন্ম ও হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের মধ্যে কোন তফাৎ দেখেন নাই। তাঁদের রাষ্ট্রচিন্তায় অখণ্ড ভারতের যে রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে, তারই বিরুদ্ধে লীগের পরিকল্পিত ভারতবিভাগের প্রস্তাব ওঠে। কেন্দ্রিয় সার্ব্বভৌমিকতায় স্বৈরাচারের যে সম্ভাবনা, তার প্রতিবাদ হিসাবে লীগের এ দাবী বোঝা যায়। কিন্তু একমাত্র প্রতিবাদ ভিন্ন লীগের পরিকল্পনার নিজস্ব কোন সার্থকতা নাই। পাকিস্তানের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে তাতে কোন সমস্যারই কোন সমাধান মেলে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশ্ন পাকিস্তানেও থাকবে। বর্ত্তমানে যেমন, তখনও তেমনি কোনোখানে হিন্দুর, কোনোখানে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকবে। এক যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত খণ্ডরাষ্ট্রে যদি সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলি পরস্পরের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার প্রশ্নের কোন সমাধান করতে না পারে, তবে সেই সম্প্রদায়গুলিই যে দুই যুক্তরাষ্ট্রের আমলে সে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে তার ভরসা কি? এক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমাধানের

যেটুকু অবকাশ, দুই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তাও নাই। বরং তখন দুটী যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থাকবে, এবং তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত খণ্ডরাষ্ট্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মনো-মালিন্য ও সংঘাতের আশঙ্কা আরো বেড়ে যাবে। ভারতীয় নিরাপত্তাও তাতে ব্যাহত হবে, কারণ যুযুধমান স্বার্থের দ্বন্দ্বে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নানা রকমে হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ ও অবকাশ পাবে।

অনাবিল ও মুক্তবুদ্ধির বিচারে একথা নিঃসন্দেহ যে স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক খণ্ডরাষ্ট্রের সংযোগে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রই হবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিয় রূপ। এ বিষয়ে মতভেদের কোন অবকাশ নাই, কিন্তু যখনই খণ্ডরাষ্ট্রগুলির ভিত্তি ও প্রকৃতি অথবা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা হয়, তখনই নানারকম মতভেদ বেরিয়ে পড়ে। দুটী প্রশ্নেই লীগের বক্তব্য অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট। খণ্ডরাষ্ট্রগুলির আয়তন, প্রকৃতি অথবা রাষ্ট্ররূপ কি হবে সে সম্বন্ধে লীগ নির্ব্বাক। যুক্তরাষ্ট্রের বেলায়ও লীগ কেবলমাত্র বলে যে দুটী যুক্তরাষ্ট্র হবে, তাদের সংগঠন অথবা খণ্ডরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের প্রশ্নে লীগ কিন্তু কোন কথা বলতে চায় না। কংগ্রেসের দাবী যে ভারতের জনসাধারণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে যে গণপরিষদ নির্ব্বাচিত করবে, সেই গণপরিষদই এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবে। লীগের কিন্তু গণপরিষদে ঘোর আপত্তি। লীগ বলে যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের আগে গণপরিষদের সংগঠন কোন দিন হয়নি, হতে পারে না, আর যদি কোন রকমে ভারতবর্ষে তা সম্ভব হয়ও, তবে তা হবে মোসলেম স্বার্থের বিরোধী। এ রকম গণপরিষদে মুসলমানেরা হবে সংখ্যালঘু। কাজেই রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে যেখানে সংখ্যাগুরু হিন্দুর সঙ্গে সংখ্যাল

মুসলমানের মতভেদ হবে, সেখানেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মতামত টিকবে না। লীগের আপত্তির মূলে এই ধারণা যে ধর্মসম্প্রদায় এক হলে রাজনৈতিক মতামতও এক হতে বাধ্য। জন্মগত কারণে হোক, অথবা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার ফলে হোক, একবার এক ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে একমত না হয়ে আর উপায় নাই।

লীগের এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত সে কথা তর্ক করে বোঝাতে হয় না। আমরা প্রতিদিন দেখি যে ধর্মমতে মিল সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মতের দারুণ অমিল রয়েছে। ইয়োরোপের প্রায় সকলেই খৃষ্টান, কিন্তু তাই বলে সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব কি অন্য কোন মহাদেশ থেকে কম? তুর্কীরাও মুসলমান, আরবী ইরাকীরাও মুসলমান, অথচ মুসলমান তুর্কীর শাসন ধ্বংস করবার জন্য মুসলমান আরবী ইরাকীরা খৃষ্টান ইংরাজের সাহায্য নিতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেনি। ধর্ম ব্যাপারে মতামত এক জিনিষ, সাংসারিক ক্রিয়াকাজে মতামত অন্য জিনিষ। তা সত্ত্বেও লীগের আশঙ্কা দূর করবার জন্য কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে মুসলমান সম্প্রদায় চাইলে পরে গণপরিষদে মুসলমান প্রতিনিধি কেবলমাত্র মুসলমানের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন। তিনি আরো বলেছেন যে এই সমস্ত প্রতিনিধি ভারত বিভাগ দাবী করবেন না বলেই তার বিশ্বাস ও আশা, কিন্তু যদি তাঁরা স্থির করেন যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে দুইটী যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে হবে, তবে সেই দাবীও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

গান্ধীজীর এ ঘোষণার পরে গণপরিষদে মুসলীম লীগের আপত্তি বোঝা কঠিন। এ কথা নিঃসন্দেহ যে গণপরিষদ এ ভাবে গঠিত হলে মুসলমান স্বার্থের কোন হানি হতে পারে না, বরং গণপরিষদের

নির্ব্বাচনেই মোসলেম জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হবে। হয়তো ঠিক এই জন্যই লীগ এতদিন গণপরিষদে রাজী হয়নি। লীগের সংগঠন ও কার্য্যক্রম দেখলে কোন সন্দেহ থাকে না যে মুসলমান অভিজাত ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বার্থসিদ্ধিই লীগের লক্ষ্য। অধুনা যে লীগের মধ্যে জনসমাবেশ, তাও ঘটেছে অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং সেই নেতৃত্ব রক্ষার জন্য। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চাষী এবং মজুরের অভাব অভিযোগের সমস্যা থেকে লীগ জনসাধারণের দৃষ্টি এতদিন ফিরিয়ে রেখেছে, মধ্যবিত্তকেও স্তোকবাক্যে অথবা ছোটখাট লাভের লোভে ভুলিয়েছে, কিন্তু একবার প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে মধ্যবিত্তের হাতে নেতৃত্ব এবং বঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যে রাষ্ট্রিক চেতনা আসবে, তার ফলে লীগের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলে উঠতে পারে, এ আশঙ্কা রয়েছে বলেই লীগনেতাদের গণপরিষদে এত আপত্তি।

এ ছাড়া গণপরিষদে লীগের আপত্তির আরো একটা কারণ ছিল। লীগ দাবী করে ভারতীয় মুসলমানের লীগই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। লীগের শক্তি এবং প্রভাব যে গত পাঁচ ছয় বৎসরে বহু পরিমাণে বেড়েছে একথা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব্বের অন্যান্য মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। পাঞ্জাবে আহরার পার্টি আজও শক্তিশালী। ধর্ম্মের আহ্বানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অভিযোগের মিলনে আহরার পার্টির যে কার্য্যক্রম, তার বিপ্লবী সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই বিপ্লবী আকর্ষণের ফলে মুসলমান কর্ম্মীদের মধ্যে সংগ্রামশীল ও স্বার্থত্যাগী একটা অংশ চিরদিনই আহরার দলের দিকে ঝুঁকে। কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে আহরার দলের কোন দ্বন্দ্ব

নাই, তবে আহরারেরা কংগ্রেসের আর্থিক কার্য্যক্রমকে আরো এগিয়ে নিতে চায়। লীগের প্রতি আহরার দলের দারুণ অশ্রদ্ধা ছিল, কারণ আহরারদের মতে লীগ প্রতিক্রিয়াপন্থী বিত্তশালীদের আড্ডা। পাঞ্জাবে যদি ভোটাধিকার আরো প্রসারিত হয়, তবে তার ফলে যে আহরার দলের শক্তি আরো বাড়বে এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

মুসলমান শাস্ত্রবিদ ও আলেমদের প্রতিষ্ঠান জমিয়তুল ওলামায়ে হিন্দেরও জনসাধারণের উপর গভীর প্রভাব রয়েছে। জমিয়ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যক্রমের সমর্থক। ধর্ম্ম হিসাবে ইসলাম মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথদ্রষ্টা এবং সেজন্য জমিয়ত চিরদিনই স্বাধীনতার সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে সমানভাবে যোগ দিয়েছে। জমিয়তের সভ্যেরা সে জন্য কারাবরণ ও অন্যান্য ভাবেও নির্য্যাতন সয়েছেন। বাঙলাদেশে জমিয়তের প্রভাব তত বেশী না হলেও যুক্ত-প্রদেশে, দিল্লী ও পাঞ্জাবে আজো জমিয়তের প্রভাব বিপুল। লীগও জমিয়তের সাহায্য নিয়েই প্রথম শক্তি সঞ্চয় করে। গণ-পরিষদের নির্ব্বাচন যদি বয়স্ক জনসাধারণের ভোটে হয়, তবে জমিয়তের প্রতিনিধিরা যে লীগের একতরফা দাবী সত্বেও সেখানে স্থান পাবেন একথা নিঃসন্দেহ।

কংগ্রেসের মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কয়েক বছর আগে একবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দাবী করেছিলেন, যে মুসলীম লীগের চেয়ে কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যের সংখ্যা বেশী। এ সম্বন্ধে জোর করে বলা কঠিন, কারণ কংগ্রেসের যেমন চাঁদা দেওয়া সভ্য রয়েছে, লীগের সে রকম সভ্য আছে কিনা সন্দেহ। তবে মুসলমান সমাজে বর্ত্তমানে কংগ্রেসের চেয়ে লীগের প্রভাব যে অনেক বেশী এ কথা নিঃসন্দেহ। গত কয়েক বছরে লীগের প্রতিপত্তি আরো বেড়েছে এবং

বর্ত্তমানে জওহরলালের কথা টেকে না। তবু কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যদের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। সংখ্যা এবং প্রতিভায় ভারতীয় মুসলমানের এক উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিনিধিত্বের দাবী কংগ্রেস আজো করতে পারে। একমাত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও গোঁড়া লীগ সমর্থকই এ কথা অস্বীকার করবে। আর একটী কথা মনে রাখা প্রয়োজন। মুসলমান চাষী ও মজুরের মধ্যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রভাব বাড়ছে, যদিও সহরে ও বিত্তশালী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আজো কংগ্রেসের প্রতি বিরাগ তীব্রভাবে দেখা যায়।

সীমান্ত প্রদেশের খোদাই খিদমৎগারের কথা আগেই বলেছি। মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য আর কোন প্রদেশেই নাই, কিন্তু সেখানেই কংগ্রেসের প্রভাবও সব চেয়ে বেশী। অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত লীগ সেখানে দন্তস্ফুট করতে পারেনি—যদিও সম্প্রতি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় সেখানেও লীগের শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সুরু হয়েছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যনীতির এই সাম্প্রতিক বিকাশ কেবলমাত্র সীমান্ত-প্রদেশে সীমাবদ্ধ নয়—পাঞ্জাব, আসাম, বাঙলা এবং সিন্ধুদেশে তার বহু নমুনা গত চার বছরে মিলেছে।

বাঙলাদেশের কৃষকপ্রজা সমিতির লক্ষ্য ও আদর্শ অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু সংগঠন ও নেতৃত্বের দিকে দৃষ্টি রাখলে তাকে মুসলমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে ধরতে হয়। রাজনৈতিক আদর্শকে বাস্তব করতে হলে সমাজের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাতে হবে—এই বিশ্বাসই প্রজা আন্দোলনের ভিত্তি। তার কার্য্যক্রম তাই জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার সঞ্চার, কিন্তু অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য এইখানে যে প্রজা আন্দোলন পার্লামেণ্টারী ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভূমিবিপ্লব সাধন করতে চায়।

চাষীর দৈনন্দিন জীবনের দাবীদাওয়ার মধ্যেই প্রজা আন্দোলনের জন্ম, গণচেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রসার ও প্রকৃতি দুই-ই বদলিয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা যত বাড়বে, কৃষকপ্রজা আন্দোলনের শক্তিও ততই বাড়বে। সেদিক দিয়ে দেখলে তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

লীগবিরোধী মুসলমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিয়া পলিটিকাল কনফারেন্স বা শিয়া রাজনৈতিক সংঘেরও নাম করতে হয়। মুসলমান সমাজে বিভিন্ন সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা, অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় শিয়ারাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তারাও রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কংগ্রেসের সমর্থক। কিন্তু সমস্ত দলগুলির মধ্যে এক দিক দিয়ে মোমিন আনসার কনফারেন্স বা মোমিন সংঘের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। মোমিম সংঘের শক্তিবৃদ্ধি অল্পদিনের মধ্যে হয়েছে, এবং লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্র ও অভিযোগ ব্যবহার করে শক্তিসঞ্চয় করেছে, লীগের বিরুদ্ধে ঠিক সেই সমস্ত অস্ত্র ও অভিযোগ ব্যবহার করেই মোমিন সংঘের শক্তি বৃদ্ধি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মোমিনদের সংখ্যা কম নয়—তাঁদের নেতা জহিরুদ্দিন সাহেব দাবী করেছেন যে মোমিনদের সংখ্যা সাড়ে চার কোটীরও উপর, কিন্তু সংখ্যা তাদের যাই হোক না কেন, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক চেতনায় তারা মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে পিছে পড়ে রয়েছে। লীগ এতদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের নাম করে কংগ্রেসের কাছে যে সমস্ত রক্ষাকবচ দাবী করে এসেছে, বর্ত্তমানে মোমিন সংঘ লীগের কাছে মোমিন আনসারদের জন্য ঠিক সেই সমস্ত রক্ষাকবচই দাবী করছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কার কি শক্তি বা প্রভাব সে সম্বন্ধে

সঠিক বলা কঠিন হলেও মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার খুব ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নাই। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কার্য্যক্রম পরস্পরবিরোধী, অনেক সময়ে একই ব্যক্তি একই কালে এ রকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তবু একথা অস্বীকার করা চলে না যে লীগমনোবৃত্তি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মুসলমানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লীগই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এবং শক্তিবৃদ্ধি থেকে বোঝা যায় যে লীগ যে দাবী করে যে লীগই ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সে দাবীর কোন মূল্য নাই। যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম অথচ অর্থনৈতিক হিসাবে খানিকটা শক্তিশালী, সেই সব প্রদেশেই লীগের প্রভাব বেশী। যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরাই সংখ্যাগুরু, সেখানে মুসলমানের বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ-দ্বন্দ্বকে চেপে রাখা চলে না। বাঙলা দেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে তাই ঘটেছে। বাঙলাদেশে এবং পাঞ্জাবে জমিদার এবং মহাজনদের মধ্যে বেশীর ভাগ অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু কৃষকশ্রেণীর অধিকাংশ মুসলমান, এবং মুসলমানের বিপুল অংশ কৃষিজীবি। কৃষকপ্রজা ও আহরার দলের উদ্ভব এই দুই প্রদেশেই হয়েছে কেন তা চিন্তার বিষয়। ঠিক তেমনি আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে মুসলমানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও বিত্তবান খোজা সম্প্রদায় এবং সবচেয়ে বেশী পশ্চাদপদ ও বিত্তহীন মোমিন আনসার উভয়েই কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্য্যক্রমের সমর্থক। লীগবিরোধী অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি একজোট বাঁধে, তবে তাদের সম্মিলিত শক্তির সামনে লীগ দাঁড়াতে পারে কিনা সন্দেহ, এবং ভারতীয় মুসলমানের সত্যিকার

প্রতিনিধি বোধ হয় সেই সম্মেলনের মধ্যেই মিলবে। মূলতঃ অভিজাত ও বিত্তবান মুসলমানের শ্রেণীপ্রতিষ্ঠান বলে ভোটাধিকার যত ব্যাপক হবে, লীগের শক্তিও ততই কমবে এ আশঙ্কাও লীগনেতাদের রয়েছে। এই সমস্ত কারণ আলোচনা করলেই কংগ্রেস মুসলমানকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দিয়েও গণপরিষদ চায় কেন, এবং লীগই বা তাতে আপত্তি করে কেন তা বোঝা যায়।
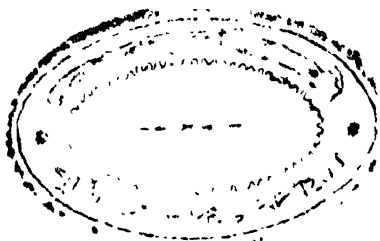
এ পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি, তাতে খাকসার আন্দোলনের কথা কিছুই বলা হয়নি। তার প্রধান কারণ এই যে খাকসার আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠেছে, এবং তার বিশদ আলোচনার আজো সময় আসেনি। তা ছাড়া বর্ত্তমানে খাকসার আন্দোলন রাজনীতি বর্জ্জন করে চলতে চেষ্টা করছে। তবে খাকসার নেতা আল্লামা মশরেকীর চিন্তাধারা, রচনা ও কার্যক্রম বিচার করলে কোন সন্দেহ থাকে না যে দৃশ্যত যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে খাকসার আন্দোলন জাতীয় প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখে বলেই বর্তমানে সমাজসেবা ও চরিত্র গঠনের প্রতি বেশী ঝোঁক দিয়েছে। আল্লামা মশরেকী সে কথা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশও অনেকবার করেছেন। একদিকে যেমন মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন আকাশকুসুম, তেমনি অন্যদিকে যে সম্প্রদায়ে মানুষের চরিত্র উন্নত সেখানে রাজনৈতিক পরাধীনতা টিকতে পারেনা একথা তিনি বারবার বলেছেন। খাকসার আন্দোলন প্রধানত মুসলমানকে নিয়ে সুরু হলেও তার সদস্যের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের লোক মেলে। স্যর ষ্ট্যাফর্ড ক্রীপস যখন এদেশে

আসেন, তখন আল্লামা মশরেকী লীগ, মহাসভা, কংগ্রেস সকলের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধকালে ভারতবর্ষ কিছুই পাবে না আর যুদ্ধের পরে সবই পাবে—ক্রীপসের এ কথা যে কত বড় ফাঁকী, আল্লামা স্পষ্টভাবে তারও রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। তবু খাকসার আন্দোলনের প্রধান ঝোঁক সমাজসেবার দিকে এবং প্রত্যেক খাকসারকে প্রতিদিন সমাজসেবায় যোগ দিতে হয়। বে-আইনী ঘোষিত হবার আগে খাকসার স্বেচ্ছাসেবকেরা সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করেছে। ভারতীয় নিষ্ক্রিয় ও জড়বাদী জনসাধারণকে সক্রিয় ও চঞ্চল করে তোলা, এবং সেই সঙ্গে সৈনিক মনোবৃত্তির প্রসারে সংগঠনশক্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতার বিকাশ তার প্রধান উদ্দেশ্য। আল্লামা মশরেকী একথাও বলেছেন যে ধনীনির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলে যদি একই পোষাকে এবং একই কালে কুচকাওয়াজে নামে, তবে তাতে সাম্যভাব ও গণতন্ত্রের প্রসারতা বাড়বে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়তা, গণতন্ত্র ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

খাকসার আন্দোলন সাক্ষাৎ ভাবে লীগবিরোধী নয়, কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও মর্য্যাদা স্বীকার করে প্রকারান্তরে লীগের মুসলমান প্রতিনিধিত্বের একচেটিয়া দাবিকে খাকসাররা অস্বীকার করেছে। আর একদিক থেকেও লীগের রাজনৈতিক মনোবৃত্তির সঙ্গে খাকসারের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার পার্থক্য সুস্পষ্ট। লীগের সদস্যদের মধ্যে মুসলমান ভিন্ন অন্য কারু স্থান নাই, বরং মুসলমানদের মধ্যেও যারা লীগপন্থী নয়, তাদের লীগ প্রত্যক্ষভাবে না পারলে পরোক্ষভাবে মুসলমান সমাজ থেকে বাদ দিতে চেষ্টা করে। অন্যপক্ষে খাকসার আন্দোলন অমুসলমানকেও

টানে এবং মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে লীগ মুখ্যত রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে একেবারে বিরূপ বা উদাসীন, অথচ লীগই ধর্মীয় একতার উপরে ঝোঁক দেয় বেশী। খাকসার আন্দোলন মুখ্যত ধর্মীয় আন্দোলন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী খাকসারদের স্বধর্মের অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পরিপূর্ণ ভাবে স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাকসার আন্দোলনে লীগের মতন ধর্মীয় জাতীয়তার উগ্র গন্ধ মেলে না। এ সমস্ত কারণে লীগ নেতারা খাকসার আন্দোলনকে খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না। কয়েকবার খাকসার আন্দোলনকে লীগের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টাও হয়েছে। তাতে কিন্তু খাকসার নেতা রাজী হননি, এবং তার ফলে লীগ ও খাকসার নেতারা পরস্পরকে প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খানিকটা অপ্রীতির চোখেই দেখেন। এখনও সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে বা শক্তি পরীক্ষায় পরিণত হয়নি কিন্তু ঘটনার পারম্পর্যে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে সে দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

লীগ যে খাকসার আন্দোলনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে তার আরও একটী কারণ আছে একেবারে গুরুতে লীগ খাকসার আন্দোলনকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে তা আমরা দেখেছি। সে চেষ্টা নিষ্ফল হলেও লীগ প্রথমে খাকসার আন্দোলনকে আক্রমণ করেনি, কিন্তু ১৯৪০ সালে খাকসার নেতৃবৃন্দ যখন সক্রিয় আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং শহীদগঞ্জের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে খাকসার কর্মী-বৃন্দের শক্তি, সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সমস্ত ভারতবর্ষে সাড়া পড়ে গেল, লীগ নেতৃবৃন্দের মনে তখন ভয় হল যে খাকসার আন্দোলনের প্রবল সক্রিয়তার সামনে লীগের নেতিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল

কর্ম্মপন্থা টিকতে পারবে না। তখন থেকেই লীগ খাকসার আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করল।

সেই বৎসরই সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সের নেতৃত্বে আজাদ কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠায় সে সন্দেহের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। পূর্ব্বেই বলেছি যে গত কয়েক বৎসরে লীগের শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও অন্যান্য মোসলেম রাজনৈতিক দল ও মতগুলির অস্তিত্ব বিলোপ হয়নি। লীগের তুলনায় তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেই দুর্ব্বল কিন্তু লীগবিরোধী সমস্ত দলগুলির সমন্বয়ে অবস্থা যে কি দাঁড়ায়, তা বলা কঠিন ছিল। যতদিন এ সমস্ত দল বিচ্ছিন্ন ছিল, ততদিন লীগ তাদের আক্রমণ করেছে কিন্তু বিশেষ ভয় করেনি। আল্লাবক্সের নেতৃত্বে যেদিন বিচ্ছিন্ন দলগুলি একত্রিত হল, তখন যে লীগ তাকে বিদ্বেষের চোখে দেখবে, তাতে বিচিত্র কি? খাকসার আন্দোলনও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোককে সমাজসেবা ও ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক সূত্রে গাঁথবার জন্যে সচেষ্ট। লীগের আশঙ্কা হল যে আজাদ কনফারেন্সের মতন খাকসার আন্দোলনও একদিন লীগবিরোধী বিভিন্ন মুসলমান দলগুলির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।

ভারতীয় মুসলমানের রাজনীতির ক্ষেত্রে আল্লাবক্সের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। এত অল্প সময়ে এত প্রতিষ্ঠা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে জোটে, কিন্তু আল্লাবক্সের বেলা বলে চলে যে তাঁর প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে স্বোপার্জ্জিত। ১৯৩৭ সালের আগে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর নাম শোনা যায়নি, অথচ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যেই তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আসরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রিত্ব তাঁর বেলায় যে প্রতিষ্ঠার কারণ

নয়, কেবলমাত্র উপলক্ষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রদেশেও বহু প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ আল্লাবক্সের মত এত সহজে ভারতীয় জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে পারেন নি। ১৯৪০ সালে আজাদ কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে তিনি যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন তা যে কোনো জননেতার পক্ষে লোভনীয়।

আল্লাবক্সের জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ তাঁর সাহস ও চরিত্রবল। সে সময়ে লীগের সৌভাগ্যের জোয়ার এসেছে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের পরাজয়ের পরে এক বৎসরের মধ্যে লীগের ভাগ্যে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। অন্যান্য কারণের মধ্যে কংগ্রেসের বিপুল বিজয়ে ইংরেজের আশঙ্কাও যে লীগের শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জিন্না সাহেবকে পূর্ব্বে কোন দিন ইংরেজ সহ্য করতে পারেনি—গোলটেবিল বৈঠকে যে ভাবে তাঁকে বিনা দ্বিধায় বাদ দেওয়া হয় পূর্ব্বেই তার উল্লেখ করেছি। এখন কিন্তু কংগেসের প্লাবনকে রোখবার জন্য ইংরেজের কাছে জিন্না সাহেবের দর অনেক বেড়ে গেল। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যর সিকান্দার হায়াৎ খাঁর সঙ্গে ইংরেজ রাজশক্তির সম্বন্ধ যে নিবিড় ও মধুর এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। ইংরেজের সমর্থন ভিন্ন তিনি যে কোন মৌলিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করেন না, এ কথাও সকলেই জানে। সাধারণ নির্ব্বাচনে বাঙলা দেশে ফজলুল হক যে ভাবে জিন্না সাহেবকে পর্য্যুদস্ত করেছিলেন, পাঞ্জাবে স্যর সিকান্দারের ইউনিয়নিষ্ট দলের হাতে লীগ তার চেয়েও বেশী নাজেহাল হয়েছিল। অথচ ১৯৩৭ সালে লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে স্যর সিকান্দার ও ফজলুল হক দুজনেই জিন্না সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এটা প্রথম দৃষ্টিতেই বিচিত্র ঠেকে। হক

সাহেবের লীগে যোগদানের পক্ষে তবু খানিকটা যুক্তি ছিল, কারণ তিনি লীগের প্রথম স্রষ্টাদের অন্যতম, এবং বাংলা দেশে যে বিরোধী-দলের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে, লীগের সাহায্য ভিন্ন তাঁদের পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। স্যর সিকান্দারের কিন্তু সে রকম কোন মুস্কিল ছিল না, এবং অন্যপক্ষে রাজশক্তির সমর্থনের ভিত্তিতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম্মপন্থা গঠিত। তাই স্যর সিকান্দারের লীগে যোগদানে এই কথাই বোঝা গেল যে ইংরেজ রাজশক্তির দৃষ্টিভঙ্গী বদলিয়েছে, পূর্ব্বেকার অস্পৃশ্য জিন্না সাহেব আজ রাজশক্তির চোখে কেবলমাত্র স্পৃশ্য নয়, বরণীয় হয়ে উঠেছেন।

এক দিকে কংগ্রেসের দ্বিধা ও কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীদের ভুল, কংগ্রেসী অনুচরদের উৎকট উৎসাহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে অবিমৃষ্য-কারিতা, অন্যদিকে রাজশক্তির সস্নেহ দৃষ্টির সমর্থনে লীগের শক্তি যে কি ভাবে বৃদ্ধি পেল, তার খানিকটা ইঙ্গিত পূর্ব্বে দিয়েছি। এই ভরা জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই আল্লা বক্স এত সত্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সিন্ধু দেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য বিপুল—একমাত্র সীমান্ত প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোথাও এ ধরণের মুসলমান সংখ্যাধিক্য নাই। বাঙলা দেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ধর্ত্তব্য নয় বল্লেও চলে। মুসলমান সওয়া তিন কোটি হলেও অমুসলমান প্রায় পোনে তিন কোটি, কিন্তু অর্থ, শিক্ষা ও অবস্থানে মুসলমানের চেয়ে অমুসলমান অনেকখানি উন্নত। পাঞ্জাবেও মুসলমান শতকরা ছাপান্ন আর অমুসলমান চুয়াল্লিশ। অথচ যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যায় অল্প, সেখানে মোসলেম সংখ্যাল্পতা ভয়াবহ। কোথাও মুসলমানের সংখ্যা শতকরা দশজন, কোথাও বা পনেরো বা খুব বেশী হলে কুড়ি বাইশ।

আল্লাবক্স তাই বুঝেছিলেন যে লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যে কেবলমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থের বিরোধী তা নয়, মুসলমান স্বার্থের আরো বেশী পরিপন্থী। সংখ্যাল্পতার উপর ঝোঁক যত কম দেওয়া হয়, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ততই কল্যাণ। বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বদলে তাহলে সর্ব্বজনস্বার্থের বিভিন্ন প্রশ্নই রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় হয়ে দেখা দেবে, নইলে সে সমস্ত প্রশ্ন পড়ে যাবে চাপা এবং একমাত্র সংখ্যাগুরু ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ঝগড়াতেই দেশ ও সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা, সময় ও উদ্যম অপব্যয়িত হবে।

আল্লাবক্সের রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় এইখানে যে সিন্ধু দেশে মুসলমানের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও একথা তিনি সহজে বুঝেছিলেন। অথবা হয়তো বলা চলে যে মুসলমান সংখ্যাধিক্য প্রদেশের লোক বলেই একথা তিনি উপলব্ধি করেন। মুসলমান যেখানে সংখ্যাল্প, সেখানে তার মনোবৃত্তি অনেকখানি আত্মরক্ষামূলক হতে বাধ্য। জিন্না সাহেব জানেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী হবার আশা তাঁর কোন দিন নাই—চিরদিনই সেখানে তাঁকে আশ্রিত হয়ে থাকতে হবে। আশ্রয়দাতার মনোবৃত্তির বিকাশ তাঁর চরিত্রে তাই অসম্ভব। অনেক সময়ে তাঁর ব্যবহারে ও কথায় বার্ত্তায় যে অসৌজন্য ও নীচতা প্রকাশ পায়, সংখ্যাল্প-মনোবৃত্তির সংকীর্ণতা ও আশঙ্কাই তার প্রকৃত কারণ। একথা তিনি বোঝেন না যে সংখ্যাল্প-মনোবৃত্তির প্রকাশে চরিত্রের যে দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে, তার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব লাভের আশা আরো পিছিয়ে যায়। আল্লাবক্স বুঝেছিলেন যে ধর্ম্মীয় পার্থক্য ও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরাতে না পারলে কোন দিন আমরা আমাদের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারব না, এবং

সেজন্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই লীগ রাজনীতিকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

আল্লাবক্সের সংগঠন শক্তিতে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার আর একটি দিক প্রকাশ পেয়েছে। লীগের বিপুল শক্তিবৃদ্ধি তিনি দেখেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তিনি লক্ষ্য করেছেন যে লীগবিরোধী যে সমস্ত মুসলমান প্রতিষ্ঠান বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, বিচ্ছিন্নভাবে দুর্ব্বল হলেও তাদের সম্মিলিত শক্তি কম নয়। সেজন্য তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক সাধনা হয়ে দাঁড়াল এই সমস্ত বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের যুক্ত কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে এক নূতন মুসলমান সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা। তিনি একথা বুঝেছিলেন যে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক মতামত ও অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, এবং সে স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা ভুল। বস্তুতপক্ষে লীগের বিরুদ্ধেও প্রধান অভিযোগই এই যে লীগ দাবী করে যে মুসলমান মাত্রেরই মুসলমান হিসাবে রাজনৈতিক মতামত এক হতে বাধ্য। মতবাদের ও অস্তিত্বগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতায় কাজ চালাবার উদ্দেশ্যেই ১৯৪০ সালে আজাদ মুসলমান কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন ও ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই কনফারেন্সের কার্য্যক্রম প্রথম থেকেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তা সত্বেও আজাদ কনফারেন্স আশানুরূপ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। তাতে আশ্চর্য্যও নাই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একযোগে কাজ করতে নামে, সেখানে তাদের কাজের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য থাকবেই, এবং বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দিতে হয় বলে তার কর্ম্মপন্থায় তীব্র একাগ্রতা আসতে পারে না। তা সত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে আজাদ কনফারেন্সের

প্রতিষ্ঠায় লীগ কর্ম্মকর্তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং এতদিন যে লীগের কথাকেই ভারতীয় মুসলমানের কথা বলে পৃথিবীময় চালু করার সুযোগ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী পেয়েছিল, তাতে বাধা পাওয়াতে তারাও অপ্রসন্ন। উভয় পরিণতির জন্যই প্রধান কৃতিত্ব আল্লাবক্স সাহেবের প্রাপ্য।

৫

মহাযুদ্ধের গোড়াতে কংগ্রেস এবং লীগের কার্য্যক্রম আবার আমূল বদলে গেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের যে সংগ্রামশীল কার্য্যক্রমের সূচনা দেখা দিল, তা বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। লীগও সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ল। পুরোণো নিয়মতান্ত্রিকতাকে কিন্তু জিয়ানো গেল না। একেতো জিন্না সাহেব প্রাক্তন কংগ্রেসী এবং বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সঙ্গে যতই ঝগড়া হোক না কেন, কংগ্রেসী গন্ধ পুরোপুরি ধুয়ে ফেলা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। যে মদরত মধ্যপন্থার ফলে সরকারী সমর্থন ও সাহায্য মেলে, আজো জিন্না সাহেব তার কায়দা পুরোপুরি দুরস্ত করতে পারেন নি। তা ছাড়া কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটীগুলির কুড়ি বৎসর প্রচারণার ফলে জনসাধারণের চেতনা রাজনৈতিক সংগ্রামে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। জিন্না সাহেবের ইচ্ছা থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করবার তাঁর শক্তি নাই। ফলে কংগ্রেসেরই মত লীগের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার লোক লীগে আসলেও কায়েমী স্বার্থের সেখানে এত প্রভাব যে আজ পর্য্যন্ত লীগ কোন দিন সক্রিয় সংগ্রামে যোগ দিতে পারেনি। তার ফলে লীগের

রাজনৈতিক কর্মসূচী ও দাবীও তাই আজো কংগ্রেসের তুলনায় অনেক নীচ সুরে বাঁধা।

লীগের সাম্প্রতিক কর্মপন্থায় এটাও লক্ষ্যণীয় যে যদিও প্রতিক্ষেত্রেই লীগ ভিন্ন কারণ দেখিয়েছে, তবু যুদ্ধের সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রতি-পদেই কংগ্রেস যা করেছে, লীগও দুদিন বাদে তার অনুসরণ করেছে। এক দিকে কংগ্রেসের বাস্তব ও কল্পিত ভুলভ্রান্তি ও অন্যায়ের জন্য লীগ কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে—অন্যদিকে প্রতিবারই কংগ্রেসের যে সিদ্ধান্ত, লীগ ভিন্ন অজুহাতে তাই গ্রহণ করেছে। ভারতীয় জনমতের সমর্থন না নিয়ে ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত ঘোষণা করায় কংগ্রেসের মতন লীগও ইংরেজ রাজশক্তির নিন্দা করেছে। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় শাসনসঙ্কট সমাধানের জন্য বড়লাটের যে প্রস্তাব, কংগ্রেসের মতন লীগও তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তথাকথিত যে ভারতরক্ষা সমিতি বড়লাট গঠন করেন, কংগ্রেসের মতন লীগও তাতে সদস্য পাঠাতে অস্বীকার করেছে। চার্চিল-মার্কা যে স্বাধীনতার প্রস্তাব ভারতবর্ষের জন্য স্যর ষ্টাফর্ড ক্রীপস নিয়ে এসেছিলেন, কংগ্রেসের মতন লীগও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। লীগ অবশ্য প্রত্যেক বারই এ রকম সিদ্ধান্তের স্বতন্ত্র কারণ দেখিয়েছে, কিন্তু কারণ যতই ভিন্ন হোক না কেন, ফল প্রত্যেক বারই হয়েছে এক।

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রভেদ দেখা দিয়েছে কর্মপন্থায়। কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য সক্রিয় আন্দোলন ও সংগ্রামে ভয় পায় না—লীগের লক্ষ্য যে সংগ্রামে না নেমে কৌশলে কি ভাবে কার্য্য উদ্ধার করা যায়। লীগ বোধ হয় ভেবেছিল যে কংগ্রেস যদি সংগ্রামে নামে, তবে সেই শক্তিদ্বন্দ্বের সময় বিনা স্বার্থত্যাগে ও প্রয়াসেই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে নেবে।

লীগের এ কার্য্যক্রমের জন্য তার সংগঠন খানিকটা দায়ী। যে প্রতিষ্ঠানে কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিপত্তি, সে প্রতিষ্ঠান যে সংগ্রামে বিমুখ হবে তা স্বাভাবিক। জিন্না সাহেবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও পেশাও এ মনোবৃত্তির জন্য অনেকখানি দায়ী। আইনজীবী সক্রিয় আন্দোলন চায় না—যুক্তিতর্ক ও কৌশলের মারপ্যাচে কার্য্য উদ্ধারেই উকিলী বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। জিন্না সাহেবও তার ব্যতিক্রম নন।

লীগের এ রকম রাজনৈতিক পাঁয়তারার ফলে ভারতীয় মুসলমানের কিন্তু গভীর ও স্থায়ী ক্ষতি হয়েছে। সারাক্ষণ কেবলমাত্র সংখ্যাল্পতার বিলাপে অনেকের মনেই এনেছে দুর্ব্বলতা এবং সে দুর্ব্বলতার ফলে অতি সহজেই তারা ইংরেজ রাজশক্তি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদেব স্বার্থের বিরোধকে বড় করে দেখতে গিয়ে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহানুভূতি হারিয়েছে এবং সেই সঙ্গে মুসলমানের মনে অন্য সকলের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তার ফলে মুসলমান সহজ ও সচ্ছন্দ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে ভুলে যাচ্ছে। সব সময়ে নিজেকে আক্রান্ত ভাবলে যে অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি গড়ে উঠে, তার ফলে চিত্তেব পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস যেদিন সংস্কারমুক্ত ও উদার দৃষ্টি দিয়ে লেখা হবে, সেদিন জিন্না সাহেবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হবে এই যে ভারতবর্ষের নয় কোটি মুসলমানের মনে তিনি যে দুর্ব্বলতা ও পরাজিত-মনোবৃত্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন, সে চেষ্টা সফল হলে ভারতীয় মুসলমান অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকতে পারতো না। ভারতীয় মুসলমানের সৌভাগ্য যে জিন্না সাহেবকে তারা একচ্ছত্র নেতা মানে নি। তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যারা দাড়িয়েছে, তারা স্বতন্ত্র ও বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর চেয়ে দুর্ব্বল হতে
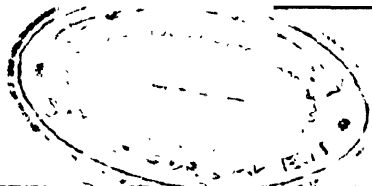
পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এই সমস্ত দলই যে মুসলমান মানসের প্রকৃত ও সার্থক অভিব্যক্তি, তাতে সন্দেহ করা চলে না।

এ কথাতে আশ্চর্য হবারও কারণ নেই। চিরদিনই মুসলমানের ইতিহাস সম্প্রসারণ ও অভিযানের ইতিহাস। সে সম্প্রসারণ কেবলমাত্র ভৌগলিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, মানস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমান চিরদিন অভিযাত্রী। মরহুম ডাক্তার ইকবালের একটী কবিতায় মুসলিম ইতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনা কীর্তিত হয়েছে। স্পেনবিজয়ী তারেক মাত্র সাত শত সৈন্য নিয়ে ইয়োরোপে নেমে সমস্ত জাহাজ পুড়িয়ে দেবার আদেশ দেন। সাংসারিক বুদ্ধিমান উপদেষ্টারা আপত্তি করেন যে তাহলে আর ফেরবার উপায় থাকবে না। তাঁরা বলেন যে বিদেশে এত কম সৈন্য নিয়ে থাকবার চেয়ে সকলে মিলে ফিরে যাওয়া শ্রেয়। উত্তরে তারেক বলেন—বিদেশ? বিদেশ কাকে বলে? যদি সমস্ত দুনিয়া আল্লার দুনিয়া হয়, তবে আল্লার বান্দা মুসলমানের পক্ষে কোন বিদেশ নাই। এ মনোবৃত্তির সঙ্গে জিন্না সাহেবের পাকিস্তানী মনোবৃত্তির পার্থক্য কি কাউকে বোঝাতে হবে?

বর্তমানে পাকিস্তানকে মুসলীম লীগ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। পাকিস্তান কি তা কেউ জানে না, স্পষ্ট করে বলতে পারে না। চারিদিকে গণ্ডী টেনে নিজেকে সংরক্ষণ যদি পাকিস্তানের অর্থ হয়, তবে মোসলেম ইতিহাসের শিক্ষা পাকিস্তানের বিরোধী। সকল দেশ ও জাতির ইতিহাসই শিক্ষা দেয় যে আত্মরক্ষায় রক্ষা নাই। ব্যক্তির মতন জাতিও কেবল তখনই বাঁচে যখন নিজেকে চারিদিকে সম্প্রসারিত করে দেয়। সংস্কৃতিকে রক্ষা করা চলে না—সংস্কৃতিকে নিত্য নব নব বিজয়ে নব জন্ম লাভ করতে হয়। যেখানেই চেষ্টা হয়েছে যে

বাইরের সংশ্রব বাঁচিয়ে নিজের সীমানা বা গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে, সেখানেই তার ফলে এসেছে জড়তা ও মৃত্যু। নদীর প্রবাহ আছে বলে তার জল কখনো খারাপ হয় না—পুকুরের সীমানা সঙ্কীর্ণ বলেই পুকুর এত সহজে মজে। ভারতীয় মুসলমানকেও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই বাঁচতে হবে।

পাকিস্থানের আদর্শ অবলম্বন করাতে লীগের উদ্দেশ্য ও কার্য্যসূচীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন এসেছে। এক অর্থে পাকিস্থানে বিশ্বাস লীগের ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দেয়। এতদিন লীগ বলে এসেছে যে ভারতবর্ষের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা ভৌগলিক যত পার্থক্যই থাক না কেন, মুসলমান হিসাবে তাদের স্বার্থ এক এবং অদ্বিতীয়, এবং সেই স্বার্থপূরণ হলে অন্যান্য স্বার্থ আপনিই পূর্ণ হবে। পাকিস্থানে এই পূর্ব্ব-বিশ্বাস ব্যাহত হয়েছে, কারণ সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানের সঙ্গে সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলমানের স্বার্থ বৈষম্যের উপরই পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা। সংখ্যাগুরু প্রদেশে মুসলমানের হাতেই আসবে রাজশক্তি—তারা হবে রক্ষক এবং অমুসলমান হবে রক্ষিত। সংখ্যালঘু প্রদেশে অবস্থা দাঁড়াবে উল্টো—সেখানে মুসলমানই হবে রক্ষিত এবং অমুসলমানের কাছে রক্ষাকবচ দাবীই তাদের প্রধান করণীয়। এক কথায় যে অবিভাজ্য মুসলিম স্বার্থের ভিত্তিতে লীগের প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু মুসলমানের স্বার্থের পার্থক্যে তার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে। একবার যদি লীগ স্বীকার করে যে মুসলমান হয়েও স্বার্থ বিভিন্ন হতে পারে, তবে সে পার্থক্য কেবলমাত্র প্রদেশের বেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রাদেশিক স্বার্থ বৈষম্যের মতন মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে মুসলীম লীগের যে আবেদন, সংখ্যাগুরু প্রদেশে তা কোনদিন সম্ভব হয়নি। সীমান্ত প্রদেশে লীগ কোনদিনই শিকড় মেলতে পারেনি এবং পঞ্জাবেও তার প্রভাব গভীর নয়। সিন্ধু ও বাঙলা দেশ সম্বন্ধেও একথা খাটে, তবু বাঙলায় যে লীগ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, মন্ত্রীত্বের প্রভাব এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অদূরদর্শিতাই তার প্রধান কারণ। এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলেনা যে গত তিনচার বছরে ভারতবর্ষে লীগের যে শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, বাঙলাদেশে জনসমর্থনলাভ করছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। কেবলমাত্র মন্ত্রীত্বের প্রভাবে জনসমর্থন লাভ করা যায় না—যদি যেতো তবে লীগ সদস্য প্রধান মন্ত্রীর আমলেও আহরার, খাকসার এবং জমিয়ত পাঞ্জাবে এত শক্তিশালী থাকত না। বাঙলাদেশে ক্রমবর্দ্ধমান মুসলমান মধ্যবিত্তের সমস্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে দেখেনি বলেই যে লীগের দিকে মুসলমান মধ্যবিত্ত ঝুঁকেছিল, এবং তাদের প্রভাব ও নেতৃত্বে জনসাধারণের মধ্যে লীগ মনোবৃত্তি পড়েছে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। বাঙলার নেতৃত্ব বহুদিন হিন্দু মধ্যবিত্তের হাতে ছিল কিন্তু সে সময় মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত অথবা চাষীমজুরের সমস্যা দূর করবার তেমন চেষ্টা হয়নি, বরং তাদের অগ্রগতিতে বাধা দেবার চেষ্টাই হয়েচে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উদার সহানুভূতি দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করেছিলেন বলে তাঁর নেতৃত্বে সকলে মেনে নিয়েছিল, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রশ্ন ওঠে নাই। তাঁর মৃত্যুর পরে বাঙলাদেশে উদার কল্পনাশীল ও শক্তিবান নেতার অভাব হয়েছিল বলেই মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে মিলন টেঁকে নাই। হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব যাঁর ভাগ্যে জুটেছে, মুসলমান তাঁকে

গ্রহণ করতে পারেনি। আবার যিনি মুসলমানের সমর্থন লাভ করেছেন, হিন্দু সমাজ তাঁকে মানে নাই। অথচ বাঙলার জনসমাবেশ এমনি ভাবে গঠিত যে কেবলমাত্র হিন্দু বা কেবলমাত্র মুসলমানের সমর্থনে নিখিল বঙ্গের নেতৃত্ব অর্জ্জন করা যায় না। আজো দেশবন্ধুর আসন শূন্য রয়েছে, কিন্তু সে আসন যিনি চান, হিন্দুমুসলমান মধ্যবিত্ত ও বিপুল মুসলমান জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাঁকে অর্জ্জন করতে হবে। তার সুযোগও বোধ হয় আজ এসেছে, কারণ কেবল মাত্র মন্ত্রীত্বের কল্যাণে লীগের যেটুকু শক্তিবৃদ্ধি, সিন্ধু ও বাঙলা থেকে বর্ত্তমানে তা অন্তর্হিত হয়েছে।

সংখ্যাগুরু প্রদেশে লীগের প্রতিপত্তি যে কম তারও কারণ স্পষ্ট। এটাও লক্ষ্যণীয় যে পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণের পরেই প্রদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হতে সুরু করে। সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলমানের স্বার্থ ও কর্ত্তব্য যখন ভিন্ন, তখন তারা যে ভিন্নভাবে নিজেদের সংগঠন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানের চিরদিনই রক্ষা-কবচের প্রয়োজন হবে, কাজেই কোন সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমান ভবিষ্যতে সংখ্যাগুরু প্রদেশের নেতৃত্ব দাবী করতে পারবেন না। আমাদের চিরদিনই বিশ্বাস যে যতদিন সংখ্যাগুরু কোনো প্রদেশের নেতা সর্ব্ব-ভারতীয় মুসলমানের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে না পারেন, ততদিন মুসলীম রাজনীতি নেতিবাচক থেকে যাবে। মহৎ নেতৃত্বের জন্য যে সাহস, উদারতা ও রাজনৈতিক বাস্তববোধের প্রয়োজন, সংখ্যালঘু প্রদেশের আত্মরক্ষামূলক আবহাওয়ায় কোনদিন তার বিকাশ হতে পারে না।

পাকিস্থানের আদর্শ তাই পরোক্ষে লীগের ভিত্তি শিথিল করে

দিয়েছে। বাইরে লীগের শক্তি ও ঐক্যের নিদর্শন যতই বেশী মনে হোক না কেন, আজ সন্দেহ নাই যে পাকিস্তানের দাবীতে বিভিন্ন প্রদেশ লীগ সংগঠন থেকে ক্রমে বিযুক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। তবু পাকিস্তানের দাবী ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা উপকার করেছে। এই দাবীর ফলে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিয়ে নতুন করে ভাবছে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের রূপ, প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়েও আজ আলোচনা উঠেছে। বিভিন্ন ভূখণ্ডের ও তথাকার জনসাধারণের স্বনিয়ন্ত্রণের জন্য যে দাবী পাকিস্তানের মধ্যে নিহিত, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তার মূল্য অনেকখানি, এবং কম লোকেই তাকে অস্বীকার করবে। বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব বাধে তখন, যখন স্বনিয়ন্ত্রণের চেয়ে ভারত-বিভাগের দিকে ঝোঁক পড়ে বেশী, অথচ আমরা দেখেছি যে কেবলমাত্র বিভাগের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সমস্যারই সমাধান মেলে না। সে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে লীগও নিজের পূর্বের জিদ খানিকটা নরম করে এনেছে। গণসংসদ লীগ পূর্বে কোনদিনই মানতে চায়নি, কিন্তু এখন লীগও স্বীকার করছে যে সমস্ত মুসলমানের মতামত নিয়ে পাকিস্তানের প্রশ্নের মীমাংসা হবে। অবশ্য এখনো লীগের দাবী যে কেবলমাত্র মুসলমানের ভোটেই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে হবে, কিন্তু ১৯৭০ সালে লীগ তাতেও রাজী হয়নি। তখন লীগ বলেছে যে লীগ চায় বলেই ইংরেজ রাজশক্তিকে পাকিস্তান মঞ্জুর করে নিতে হবে। কংগ্রেসেরও খানিকটা মত পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাদেশিক সরকারের হাতে সমস্ত উদ্বৃত্ত শক্তি থাকবে একথা স্বীকার করে বোম্বাইতে সম্প্রতি যে প্রস্তাব কংগ্রেস কমিটী গ্রহণ করেছে, তাতে প্রকারান্তরে প্রাদেশিক স্বনিয়ন্ত্রণ স্বীকার করা হয়েছে। পূর্বে কোনদিন কংগ্রেস প্রদেশের

হাতে এতটা শক্তি দিতে স্বীকার করেনি। আজাদ কনফারেন্সে সম্মিলিত বিভিন্ন দল ভারতীয় রাষ্ট্ররূপের যে পরিকল্পনা করেছিল, কংগ্রেসের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে তাকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বীকার করা হয়েছে। হিন্দু মহাসভার মনোভাবেরও যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তাতে বিভিন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে বোঝাপড়া আজ পূর্ব্বেকার চেয়ে সহজ মনে হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সক্রিয়, তার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দলের মতানৈক্য শিথিল হয়ে আসতে বাধ্য—যদি না আসে তবে ভারতবর্ষের পক্ষে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

ভাদ্র, ১৩৪৯

পুনশ্চ

এ প্রবন্ধটী গত বৎসর রচিত। কংগ্রেস শ্রাবণ মাসে বোম্বাই প্রস্তাব গ্রহণ করায যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, ভারতের জনসমুদ্রে যে উদ্বেলতা আসে, আজো তার স্বরূপ নির্ণয়ের দিন আসে নাই। লীগ ভাদ্র মাসে কংগ্রেসের প্রস্তাবের জবাব দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার মধ্যেও জিন্না সাহেবের নেতৃত্বের দুর্ব্বলতা শোচনীয ভাবে ধরা দেয়। কংগ্রেসকে কটূক্তি করেই তিনি কর্ত্তব্য উদযাপন করেন কিন্তু ভারতীয় শাসনসঙ্কট সমাধানে লীগেরও যে দায়িত্ব আছে এ রকম কোন ইঙ্গিত এ দুর্দ্দিনেও দেখা দেয় নাই। গান্ধীজীর উপবাসে আর একবার সমগ্র দেশে চাঞ্চল্য আসে—একমাত্র লীগ ভিন্ন বাকী সমস্ত দল সমবেত ভাবে গান্ধীজীর মুক্তি ও ভারতীয় অচল অবস্থার অবসানের চেষ্টা করে। অবশ্য বীর সভারকারের সঙ্গে এ বিষয়েও জিন্না সাহেবের অদ্ভুত মতৈক্য দেখা যায়। স্যার সিকান্দারের আকস্মিক মৃত্যুতে ও আততায়ীর হস্তে আল্লাবক্স নিহত হওয়ায় আবার নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। লীগের কার্য্যক্রমেরও নিগূঢ় পরিবর্ত্তন হয়েছে মনে হয়, কারণ ইংরেজ রাজশক্তির সাহায্যে মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশে লীগমন্ত্রিত্ব কায়েম করার যে চেষ্টা নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, কোন গোপন

সমঝোতা ভিন্ন তার অন্য কারণ বোঝা যায় না॥ জিন্না সাহেবের রূপান্তরও জনসাধারণকে বিস্মিত করেছে, কারণ বর্ত্তমানে ইংরেজ রাজশক্তির কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি ভিন্ন তাঁর আর অন্য কোন বক্তব্য নাই। আসামে, সিন্ধু দেশে, বাঙলায় ও সীমান্ত প্রদেশে প্রাদেশিক লাটেরা লীগমন্ত্রিত্ব গঠন ও কায়েমী করবার জন্য যে ভাবে নিয়মতান্ত্রিক সমস্ত রীতি ও রুচিকে লঙ্ঘন করেছেন, জিন্না সাহেবের নব বিকশিত বৃটিশ সাম্রাজ্যপ্রীতির পুরস্কার ভিন্ন তার আর কোন অর্থ হয় না। দিল্লীতে জিন্নাজী সদম্ভে বলেছিলেন যে গান্ধীজী যদি তাঁকে পত্র লেখেন, তবে সে পত্র আটকাবার সাহস ভারত সরকারের হবে না। গান্ধীজী জিন্নাজীকে চিঠি লিখলেন, ভারত সরকার সে চিঠি বন্ধও করল কিন্তু তখন আস্ফালনের বদলে জিন্নাজীর কণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদের স্বরই বেজে উঠল। এ সমস্ত ঘটনাই এত সাম্প্রতিক যে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাদের বিচার কঠিন। বিশেষভাবে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের পশ্চাদপটে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ যে বিক্ষোভ, তার গতি ও লক্ষ্য কোথায় কোন বন্দরে নিয়ে আমাদের ভাঙা তরীকে তুলবে, কে বলতে পারে ?

আষাঢ়, ১৩৫০